ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ
একটি উৎসের সন্ধানে

শ্যামা প্রসাদ বসু

ক্রান্তিক প্রকাশনী
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
ব্লক ৫ স্টল ৩১
কলকাতা ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়ের
হাতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে
এবং
সেই সাথে
যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে
সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

"আমাকে ফাঁসী দিতে পারেন বা আমার মত কাউকে, রোজ, কিন্তু হাজার হাজার লোক আমার জায়গায় উঠে দাঁড়াবে এবং আপনাদের উদ্দেশ্য কখনো পূর্ণ হবে না।"

—বিহারের কমিশনার টেলারের প্রতি মহাবিদ্রোহের শহীদ পুস্তক বিক্রেতা পীর আলির উক্তি। (জুলাই, ১৮৫৭)

"এইটিন ফিফটি-সেভেন", পৃঃ ২৫

১৮৫৮'র মে মাসের কোনো এক দুপুরে। লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহের অপরাধে সারিবদ্ধ অবস্থায় সিপাহীদের একে একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তদারকি করছে অন্যান্য ইংরাজ অফিসারদের সাথে তাদের অনুরক্ত সেবক তিলোউই গ্রামের জমাদার সীতারাম পাণ্ডে। তীব্র নজর—কেউ যেন পালাতে না পারে। হঠাৎ এক বন্দীর চেহারার উপর দৃষ্টি পড়ে গেল। আচ্ছা, তুমি কী আনন্দীরাম পাণ্ডের রেজিমেণ্টে ছিলে ?—"আমি আনন্দীরাম পাণ্ডে।"

না, কখনো না। সীতারামের মনে হল ও ভুল শুনছে।

—"বহুদিন দেখিনি। শুনেছি আমার বাবা ৩১নং নেটিভ ইনফেন্ট্রিতে কাজ করতেন। নাম জমাদার সীতারাম পাণ্ডে। গ্রাম তিলোউই।"

সেই বধ্যভূমিতে পিতা-পুত্র নিঃস্পন্দের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। তবে আনন্দীরাম বীরের মতই ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেছিল। বারণ করেছিল ইংরেজের কাছে ক্ষমা না চাইতে।

"দি সাউণ্ড অব ফিউরী", পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

ভূমিকা

একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মহাকাব্য পাঠের মতই এক মহান আত্মোপলব্ধি। তবু মহাকাব্যের মত তারও ভাষ্যকারের প্রয়োজন পড়ে—বরং একটু বেশি। যিনি পাঠককে শুধু রসাস্বাদনে নয় তাঁকে একটি দৃষ্টিভংগীও গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। মনস্ক পাঠক সেই সাহায্য নিয়ে তাঁর স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা গড়ে তোলেন, যা' ভাষ্যকারের নাও হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষা যেখানে শোষণ-ভিত্তিক সেখানে পাঠক অতি সহজে ভাষ্যকারের শ্রেণী চেতনার শিকার হয়ে পড়েন। ১৮৫৭'র পর একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে চলল। মহাবিদ্রোহের উপর রচিত হয়েছে দেশে বিদেশে শত শত বই। এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। এই অসংখ্য ইতিহাস গ্রন্থের ভাষ্যকার বা ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যাকে মোটামুটি দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী (যেমন, কেই, ম্যালেসন) বা নয়া সাম্রাজ্যবাদী বক্তব্য, যারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ঔদার্য নিয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশের বেনামীতে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রবক্তা (যেমন, কোলিয়ার, পিটার হার্ডি) আর অপরটি পরাধীন ভারতে তাৎক্ষণিক ইংরেজ-বিরোধী ভূমিকা পালন করলেও আবেগমথিত জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ঘেরাটোপে আবদ্ধ। ফলে ঘটনা হয়েছে অতিরঞ্জিত আর স্বাজাত্যাভিমান পরিণত জাতি বিদ্বেষে।

প্রকৃত পক্ষে মহাবিদ্রোহের সামগ্রিক বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও ঘটনাপঞ্জীর দ্বন্দ্বমূলক বিচারের অভাবে একজন ভারতীয় পাঠক দেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে মৌখিক রায় দিয়েও নিজের বিচার এবং বিবেকের কাছে কেমন যেন দুর্বল বোধ করেন। তাঁর সামনে উদাহরণের পর উদাহরণ সাজানো থাকলেও ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁকে তা' নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি করে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ আরেক দিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ স্বাধীন অনুসন্ধিৎসু মানসকে অতি সহজে সন্দেহাক্রান্ত করে তোলে।

তাই মহাবিদ্রোহের উপর কয়েকশো' বই লেখা হলেও তার দ্বন্দ্ব মূলক বিচার—যার সূত্রপাত মার্কস ও এঙ্গেলসের কিছু প্রবন্ধ ও চিঠির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা' বোধ হয় আজো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। বর্তমান বইটি তারই এক সামান্য প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। সীমিত পৃষ্ঠার মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোর দ্বান্দ্বিক বিচারের মধ্য দিয়ে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্যান্য বইয়ের কথা বাদ দিলেও যে বিষয়বস্তুর উপর কেবল ইংরাজের সরকারী ইতিহাস বিশাল ছ' খণ্ডে রচিত হয়েছে সেখানে বলাই বাহুল্য বর্তমান ক্ষুদ্র বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী সম্বলিত কোনো ইতিহাস বচনার দাবী কবে না।

মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত মূল উপাদানগুলি আজ আব কারুব অনায়ত্ত নয়। এই শতকেব দ্বিতীয় ভাগ থেকে দেশে-বিদেশে এমন কিছু প্রথিতযশা ঐতিহাসিক উপবোক্ত বিষয়বস্তুব উপব তাঁদেব অসমান্য গবেষণাগ্রন্থ সব প্রকাশ কবেছেন যে—যার ফলে মূল্যবান অপ্রকাশিত দলিল বিশেষ আব দৃষ্টি গোচবেব বাইবে নেই বললেই চলে। বর্তমান লেখক যদিও সাধ্যমত বিভিন্ন সমসাময়িক গ্রন্থ ও দলিল পাঠেব চেষ্টা কবেছেন তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল উদ্ধৃতিব জন্য তাঁকে নির্ভর কবতে হযেছে গবেষকদেব প্রকাশিত গ্রন্থের উপব। অনন্যোপায় হযে তাঁদেব দেয়া উদ্ধৃতিব সত্যতাকেই স্বীকাব কবে নিতে হয়েছে। অবশ্য মনে বাখা দবকাব আজ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিকই সহকাবী গবেষকদেব সাহায্য ব্যতীত বিদ্রোহ সংক্রান্ত বিপুল পবিমাণ উপকবণ একক সংগ্রহ কবতে পাবেননি। তা' ছাড়া আর্থিক অনুদানেব কথা তো বাদই দিলুম।

গ্রন্থপঞ্জীতে কেবল আমি সেইগুলিবই নাম দিয়েছি—যেগুলো কেবল প্রসঙ্গক্রমে এসেছে—অন্যথায় এ তালিকা বিপুল কলেবব নিত। কোনো বকম আর্থিক সাহায্যেব অভাবে একক প্রচেষ্টাব কাবণে এই বইযেব অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুদ্রণে কিছুটা দৈন্য থেকে গেল—তবু বিষয়বস্তুব গৌববে আশা কবি সুধী পাঠক তা ক্ষমা কবে দেবেন। এ বই প্রকাশে যাঁবা আমায় নানাভাবে সাহায্য কবেছেন, তাঁবা হলেন :—অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য, ডঃ বাসবিহারী দত্ত, শ্রীশঙ্কব মুখোপাধ্যায, শ্রীসুশান্ত হাজবা, শ্রীবিনয় মল্লিক, শ্রীসতীশ মিশ্র শ্রীঈশ্বব দত্ত ও শ্রীসুবিনয় ঘোষ।

শিল্পী শ্রীপাচু গোপাল দত্ত এই বইয়েব প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে এবং প্রাক্তন এম. পি. অধ্যাপক হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁব একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ আমাকে পড়তে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কবেছেন। এই বই লেখাব বিভিন্ন স্তরে যাঁব সাথে আলোচনা করে উপকৃত হযেছি তিনি হচ্ছেন তরুণ অর্থনীতিবিদ শ্রীপ্রদোষ নাথ। অবশ্যই মতামতেব দায়-দায়িত্ব তাঁবনেই।

এই বইযে প্রকাশিত মন্তব্যগুলো যদিও নির্দ্বিধায় সংকোচহীন ভাবে করা হয়েছে তবুও একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না যে মন্তব্যগুলোর লক্ষ্য ঐতিহাসিকদেব বক্তব্য, ঐতিহাসিক নন, সাম্রাজ্যবাদ, কোনো জাতি নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. History of the Sepoy War; Kaye, John; 3 VOLS; London 1864-7
   সংক্ষিপ্তকরণ :—(কেই)
2. The Indian Mutiny; Malleson, G, 6 VOLS; London, 1878-80 (ম্যালেসন)
3. Cawnpore; Trevelyan, G. O; London, 1866 (ট্রেভেলিয়ান)
4. Forty-one Years in India, Lord Roberts; VOL-1; London, 1897 (রবার্টস)
5. A Biographical Sketch of Sir Henry Havelock; Brocke, W; London, 1858 (ব্রোক)
6. Memoirs of a Bengali Civilian; Beames, John; London, 1961 (বীমস)
7. Indian & Home Memories; Cotton, H; London, 1911 (কটন)
8. The Empire of the Nabobs; Hutchinson, L, London, 1937 (হাচিনসন)
9. The Sound of Fury; Collier, R; London, 1963 (কোলিয়ার)
   [লেখক অসংখ্য অপ্রকাশিত দলিল, ডায়েরী এবং চিঠি ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৯]
10. The Muslims of British India, Hardy, P; Cambridge, 1972 (হার্ডি)
11. Red year : The Indian Rebellion of 1857; Edwards, M; London, 1973 (মাইকেল)
12. English Social History; Travelyan, G. M., London, 1962 (সোশ্যাল হিষ্ট্রি)
13. A History of India, Spear, P.; Penguin, 1978 (স্পীয়ার)
14. New Cambridge Modern History; VOL-X
15. Eighteen Fifty-Seven; Sen, S. N.; Delhi, 1957 (সেন)
16. British Paramountcy and Indian Renaissance; Part. I; Majumdar, R. C.; Bombay, 1963; (মজুমদার)
17. History of the Freedom Movement in India; VOL-I; Majumdar, R. C; Calcutta, 1971; (ফ্রিডম. মুভ)

18. The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857 ; Majumdar, R. C. ; Calcutta, 1963 (সিপয় মিউটিনি)

19. Advanced History of India ; Majumdar, R. C ; (অ্যাডভান্স. হিষ্ট্রি)

20. Modern India , Bipan Chandra ; New Delhi, 1977 (বিপান)

21. The Rise and Fall of the East India Company ; Mukherjee, R. K. ; Bombay, 1973. (রামকৃষ্ণ)

22. India's struggle for Freedom ; Mukherjee, H. Calcutta, 1962 (মুখার্জী)

23. Nana Sahib and the Rising at Cawnpore , Gupta, P , Oxford, 1963 (গুপ্ত)

24. Medieval India , Part-II ; Satish Chandra , New Delhi, 1980 ; (সতীশচন্দ্র)

25. The Mughal Empire , Srivastava, A. L , Delhi , 1959 , (শ্রীবাস্তব)

26. Tatya Tope , Dharm Pal , 1955 , (ধরমপাল)

27. Civil Disturbances during the British rule in India (1765-1857) ; Choudhury, S. B. ; Calcutta, 1955 ; (চৌধুরী)

28. Eurpoe since Napoleon ; Thomson, D. , Cambridge, 1965 , (থমসন)

29. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯ , মার্কস-এঙ্গেলস , মস্কো, ১৯৭১ মার্কস)

30. লেনিনবাদের ভিত্তি , জোসেফ স্তালিন , কল, ১৯৭৯ ; (জোসেফ স্তালিন)

31 ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ; প্রমোদ সেনগুপ্ত ; ১ম খণ্ড , কলকাতা, ১৯৭১ , (সেনগুপ্ত)

মুদ্রণ প্রমাদ

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
১৬	১৮৭৫	১৮৫৭
২৩	১৩৮৬	১৫৮৬
২৪	৬৬৪৬	১৬৪৬

ঠিকানা ঃ—শ্যামা প্রসাদ বসু, এম. এ. পি. এইচ. ডি. ; আমলাপাড়া, পুরুলিয়া (৭২৩১০১)

১৯২৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের সদস্য লর্ড ব্রেন্টফোর্ড একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় কেন ব্রিটেন ভারত জয় করেছে তার উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলেন। "আমরা ভারতীয়দের মঙ্গলের জন্য ভারত জয় করিনি। জানি মিশনারীরা অনেক বক্তৃতায় বলেন ভারতীয়দের মানোন্নয়নের জন্য আমরা ভারত জয় করেছি। এটা হতে পারে না। আমরা তরবারির দ্বারা জয় করেছি এবং তরবারির দ্বারাই একে ধরে রেখেছি। সাধারণভাবে ব্রিটিশ পণ্য এবং বিশেষ করে ল্যাংকাশায়ারে প্রস্তুত পণ্য বিক্রির জন্যই একে আমরা ধরে রেখেছি।" (হাচিনসন, পৃঃ ১২১) এরও প্রায় সত্তর বছর পূর্বে মহাবিদ্রোহের এক বছরের মধ্যে (১৮৫৮) লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা উইলিয়ম হাওয়ার্ড রাসেল ভারতে আসেন মহাবিদ্রোহের কারণগুলি অনুসন্ধানের জন্য। তিনি তাঁর ডায়েরি'তে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চরিত্রটি সম্পর্কে লেখেন: "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের শাসনের মূল ভিত্তি হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ।" (ধরমপাল, পৃঃ ৭) এই শক্তি প্রয়োগ যে কি ভয়াবহ আকার নিয়েছিল তার প্রমান পাওয়া যায় ১৭৮৯ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাত্র বত্রিশ বছরের মধ্যে কোম্পানার গবর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের রিপোর্টে। তিনি জানাচ্ছেন ভারতে "কোম্পানীর শাসনে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং জন্তু জানোয়ার ছাড়া আর কেউ বাস করে না।" (রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৪০৪-৪০৫) মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে ও পরে কার্লমার্কস ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করে "নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন" পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। হাউস অব কমন্সে প্রদত্ত রিপোর্ট ও সংখ্যাতত্ত্ব ছিল প্রবন্ধগুলির মূল ভিত্তি। তাঁর মতে ব্রিটেনে শাসকশ্রেণীর সমৃদ্ধির একটি প্রধান উৎস ছিল ভারতের উপনিবেশিক লুণ্ঠন। ফলে ভারতের অর্থনীতির একটি একটি করে সমস্ত শাখা ভেঙে পড়ে। এদেশের একদা সমৃদ্ধ জনগণ চূড়ান্ত রকমের দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হল। তিনি আরো বলেন ব্রিটিশ হামলাদাররা পূর্তকর্মে অবহেলা করে ভারতের সেচ কৃষির ধ্বংস সাধন করেছে। স্থানীয় শিল্প, বিশেষ করে তাঁত ও চরখাকে ধ্বংস করে তারা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

(মার্কস, পৃঃ ৮-৯)

ভারতের স্বনির্ভরশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোটাকে ইংলণ্ড এইভাবে চূর্ণ করে

দিল কিন্তু পুনর্গঠনের কোনো উদ্যম নিলনা। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়ে উঠল না কোনো যন্ত্র শিল্প। বরং পলাশীর লুঠের দ্বারা ইংলণ্ডে যে শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত হল তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেশীয় শিল্পকে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে এ দেশকে এক কাঁচামালের বাজারে পরিণত করার চক্রান্ত নেয়া হল।

১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্নবীকরণের প্রশ্নটির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজিপতিরা বণিক পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার থেকে ভারতকে মুক্ত করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। শুরু হল ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত পন্যের বিনাশুল্কে প্রবেশাধিকার। আর অন্যদিকে ব্রিটেন তথা ইউরোপের বাজারে ভারতের শিল্পজাত পণ্য যাতে উৎসাহ না পায় তার জন্য চাপিয়ে দেয়া হল কড়া হারে শুল্ক। এই হার কোথাও কোথাও ৪০০% পার্সেণ্ট ও হয়ে দাঁড়ালো। এই সব শুল্কের প্রধান আক্রমণের বস্তু ছিল ভারতে তৈরী ক্যালিকো, মসলিন এবং চিনি। চিনির উপর তো প্রকৃত মূল্যেব চেয়েও তিনগুণ বেশি শুল্ক বসেছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. এইচ উইলসন ও স্বীকাব করতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। 'ব্রিটেনের শিল্পপতিরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্র দিয়ে তাদের প্রতিযোগীদের গলা টিপে মেরেছিল।" কার্ল মার্কস্ লিখছেন, যে ভারত ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মুখ্যতঃ রপ্তানীকারক দেশ ছিল সেই এখন আমদানিকারক দেশে রূপান্তরিত হল এবং এত দ্রুত যে ১৮২৩ সালে যে বিনিময় হার ছিল টাকায় ২ শিলিং ৬ পেন্স তা নেমে দাঁড়ালো ২ শিলিংএ। দুনিয়ার সুতিমালের বৃহত কারখানা ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজী টুইষ্ট ও সুতীবস্ত্রে। পাউণ্ডের মূল্যে ভারতে আমদানিকৃত ব্রিটিশ সুতীবস্ত্রের মূল্য যেখানে ১৮১৩ সালে ছিল ১১০,০০০ পাউণ্ড সেখানে মহাবিদ্রোহের ঠিক আগের বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬,৩০০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৫৬ সালেই ভারতবর্ষ যে কাঁচাতুলো ইংলণ্ডের কারখানায় চালান দিল তার মূল্য হবে ৪,৩০০,০০০ পাউণ্ড। ১৭৮০ সালে ইংলণ্ডের ভারত বানিজ্য ছিল গোটা বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র একের বত্রিশ ভাগ আর ১৮৫০ সালে কেবল সুতীমাল উৎপাদন থেকেই এল সমগ্র জাতীয় আয়ের একের বারো ভাগ এবং ভারতে রপ্তানীর পরিমাণ হয়ে দাঁড়ালো সমগ্র বৈদেশিক বানিজ্যের একের আট ভাগ। (মার্কস, পৃঃ ২৯-৩১)

এদিকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের ভূমি মালিকানার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দিল। আবার অন্যদিকে জমিদারি ও রায়তওয়ারি এই দু'ধরণের ভূমি খাজনা ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে তারা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় বহু সামন্ত অবশেষকে জিইয়ে রাখল। মার্কসের মতে এর ফলে দেশের অগ্রগতি মন্দীভূত হল এবং ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ল ভারতীয় কৃষকরা। ভারতে ব্রিটিশ কর্তারা রায়ত চাষীর ওপর চাপায় অসহ্য করভার। স্থানীয় সামন্ত অভিজাত ও উপনিবেশিক রাষ্ট্র এই দুনো জোয়ালের তলায় তারা নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। অতি গুরুভার ট্যাক্স আদায়, জবরদস্তি ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের তারা শিকার হল। আশ্চর্য এই, সংগৃহীত করের কোনো অংশই ভারতীয় জনগণের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে পূর্তকার্যে ব্যবহৃত হল না। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশরা যে দুর্দশা চাপিয়েছে মার্কস্ তাকে হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চেয়ে মূলগত ভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে দানবীয় বলতেও দ্বিধা করেননি।

দেশীয় শিল্পধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে সম্পদের মূল উৎসটিও শুকিয়ে গেল এবং কারিগর, ব্যবসায়ীরা দুঃখের শেষ সীমায় পৌছালো, যা ভারতীয় অর্থনীতিতে আনলো এক সুদূর প্রসারী তাৎপর্য। কারণ গ্রামের কারিগররা অংশতঃ কৃষকও ছিল। আর এই কৃষকরাও ব্রিটিশ নিযুক্ত গোমস্তা। আর ফড়েদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল। তারা বাধ্য হচ্ছিল কম দামে অথবা বিনা দামে শস্য প্রদান করতে। ফলে যে কৃষি কর্ম ছিল ভারতীয়দের একমাত্র জীবিকা সেই কৃষিকর্মও আর নিরাপদ রইল না কোম্পানীর নিত্য নূতন দাবীর জন্য। সারা বছরের অন্ততঃ দু'মাস তাদের এমন অবস্থায় কাটতো যখন সামান্য চাল কেনারও সামর্থ থাকতো না।

এদিকে নোংরাবাহী নর্দমা দিয়ে অবিরাম যেমন জল প্রবাহিত হয় তেমনি ভারতের ঐশ্বর্য জলের মত নোংরা পথে ভারতের বাইরে চলে গেল। ১৮৩৮ সালে "ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া"র লেখক মণ্টেগোমারী মার্টিন একে "ড্রেন" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে গত পঞ্চাশ বছরে ৮,৪০০ কোটি টাকা ভারত থেকে ইংলণ্ডে পৌচেছে। (রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৮০) প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু এবং মুসলমান সম্রাটরাও 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি' কিন্তু তাহলেও সে লুণ্ঠিত অর্থ এ দেশেই বিলাস ব্যসনে এবং সৌধ-স্থাপত্য নির্মানে তাঁরা ব্যয় করতেন। ফলে কারিগর থেকে নর্তকী পর্যন্ত

বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কিছু না কিছু উপকার পেয়েছেন। দেশের অর্থ ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। কার্ল মার্কসও এই ড্রেনের ছবি এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ব্রিটেনের প্রায় হাজার দশেক ব্যক্তি ভারতে শাঁসালো পদে অধিষ্ঠিত এবং বেতন, ভাতা বাবদ যে অত্যধিক সুবিধা ভোগ করছেন তার অধিকাংশই তাঁরা স্বদেশে পাচার করছেন। বিভিন্ন সার্বিস থেকে যারা অবসর নেয় তারা প্রতিবছর তাদের বেতন থেকে প্রভূত পরিমাণ সঞ্চয় সঙ্গে নিয়ে যায়। ভারতের বাৎসরিক নিঃসরণের উপর এটা হল বাড়তি, এ ছাড়াও ভারতে ছ' হাজার কি তারো বেশি ইউরোপীয়ানরা বাস করে যারা বানিজ্য বা ব্যক্তিগত ফাটকায় নিযুক্ত। গ্রামাঞ্চলের কিছু আখ কফি ও নীলকর ছাড়া তারা অধিকাংশই কলকাতা. বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাগোয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, প্রধানতঃ বনিক, এজেন্ট ও কারখানা মালিক। আমদানি রপ্তানির প্রতিক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ কোটি ডলার মূল্যের ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই এদের হাতে। অতএব মুনাফাও নিঃসন্দেহে বেশ বড়ো। (নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন, ২১শে সেপ্টেম্বর. ১৮৫৭) এমনকি মহাবিদ্রোহের শেষ চব্বিশ বছরেও (১৮৩৪-৩৫ থেকে ১৮৫৭-৫৮) "হোমচার্জ" এবং "অতিরিক্ত ভারতীয় রপ্তানী" হিসেবে যে টাকা ইংলণ্ডে চালান গেছে তারও পরিমাণ ছিল ১৫১, ৮৩০, ৯৮৯ পাউণ্ড। অর্থাৎ এ সময়ে ভারতে সংগৃহীত রাজস্বের গড় পড়তা ৬,৩২৫, ৮৭৫ পাউণ্ড বা অর্ধেক পরিমান রাজস্ব প্রতি বছর এ দেশ থেকে পাচার হয়েছে। (রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৮২)

আশ্চর্যের কথা এই নিষ্করুণ লুঠের চিত্র ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পাতায় প্রায় অনুপস্থিত। পি. ঈ. রবার্টস (১৯২২) যেমন লেখেননি তেমনি স্পীয়ারও (১৯৭৮) এই নির্মম শোষনকে মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ হিসেবে ভাবতে প্রস্তুত নন। যেমন প্রস্তুত নন ডডওয়েল ১৯৩২ সালে অথবা কোলিয়ার ১৯৬৩ সালে। অবশ্য মহাবিদ্রোহের সমসাময়িক রেভারেণ্ড উইলিয়াম ব্রোকও (১৮৫৮) তাঁর বইতে বিদ্রোহের অন্যান্য কারণগুলি সাড়ম্বরে বর্ণনা করলেও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক লুঠেরার ভূমিকাটিকে সযত্নে বর্জন করেছেন।

তবে ভারতীয়রা যে নানাবিধ অন্যায় করের সম্মুখীন হয়েছিল এ সত্য প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই কম-বেশি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৩৭

সালে ফ্রেডারিক জন শোর "নোটস্ অন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স" (২য় খণ্ড) এ মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয়দের উপর যতটা পারা যায় ততটাই কর চাপানো হয়েছে। আমাদের কাছে এটা গর্বের ব্যাপার ছিল যে দেশীয় শাসকদের চেয়ে কত বেশী রাজস্ব আমরা জোর করে আদায় করতে পারি। ভূমিরাজস্ব ছাড়াও বহুবিধ কর ছিল। প্রতিটি ফেরি ঘাটে 'টোল' না দিয়ে এক ব্যক্তির পক্ষে কুড়ি মাইলও ভ্রমণ করা সম্ভব ছিল না। (মজুমদার, পৃ. ৩৯৬) মহাবিদ্রোহের সময়ে দিল্লী থেকে বিদ্রোহীরা যে ঘোষনাপত্র জারী করেছিলেন তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল কিভাবে ইংরাজরা চৌকিদারী করকে দু'গুন, তিনগুন থেকে একেবারে দশ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে যদি চাকুরীর সন্ধানে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে হয় তাহলেও তাকে রাস্তা ও গোরুর গাড়ীর জন্য টোল দিতে হত। (সেন, পৃঃ ১) শ্রমিকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য নুনের উপরও চড়া হারে কর বসানো হয়েছিল। সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার এক জীবন্ত ছবি ১৮৪৩ সালে জর্জ টমসনের দেয়া বক্তৃতার মধ্যে ধরা পড়ে। সদ্য ভারত প্রত্যাগত টমসন স্বদেশবাসীর কাছে চ্যালেঞ্জের ভংগীতে বলেন, "কারুর যদি অবিশ্বাস হয় তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর সাথে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলো দেখে আসতে পারেন—কিভাবে ক্ষুধায়, অনশনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ অস্থি চর্মসার হয়ে কেবল ধুঁকছে··· । আর এসবই ঘটছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ব্রিটিশ ভারতে। এগুলো অভূতপূর্ব অকল্পনীয় ছিল না। উত্তরের প্রদেশগুলোতে ১৮৩৫-৩৬এ দুর্ভিক্ষ হল। পূর্বাঞ্চলে ১৮৩৩এ আর দাক্ষিনাত্যে হয়েছিল ১৮২২-২৩ সালে। কিন্তু থেমে যায়নি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বেড়েই চলেছে।" (মজুমদার, পৃ. ৩৯৮-৪০০) অথচ এদিকে ভারতবাসীকে অনাহারে রেখে ব্রিটেনে এদেশ থেকে খাদ্য আমদানী অব্যাহত রইল। তার পরিবর্তে নিরন্ন ভারতবাসীর প্রাপ্য হল শুধু অকথ্য জুলুম। ১৮৫৫ সালে গবর্নর-জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসী কোম্পানীর ডিরেক্টর-দের কাছে এক চিঠিতে মন্তব্য করেন, "প্রতিটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশেই অধঃস্তন কর্মচারীরা কোনো না কোনো আকারে জুলুম প্রয়োগ করে" সে বিষয়ে বহুদিন থেকেই তিনি নিঃসন্দেহ।

এই ছিল মহামান্য জন কোম্পানীর শাসন আর শোষণ। আর তাই দেখে মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের বুঝি নিদ্রিত বিবেক

আতংক জেগে উঠত! কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ স্তার চার্লস নেপিয়ার হয়ত উদ্‌ভ্রান্তের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—ভাল করে লক্ষ্য করতেন হঠাৎ কোনো বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠল কিনা। অথবা লর্ড মেটক্যাফ নির্জনে ফিসফিস করে সহচরদের বলছেন, "একদিন হয়ত সুন্দর সকালে উঠে দেখব ভারতে আমাদের সব সাহেবদের গলাকাটা।" (ব্রোক, পৃ. ১২৯)

এ আতংকে যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল তা'নয়। তাব প্রমাণ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭'র মধ্যে এমন একটি বছরও পেরোয়নি যখন কোনো না কোনো অসামরিক বা সামবিক অভ্যুত্থান দেশে ঘটেনি। (চৌধুরী, পৃ XXII)

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষককে জমিদাবের প্রজায় পরিণত করে এদেশে সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে কায়েম করল। এই প্রসংগে মার্কস "ক্যাপিট্যাল" (৩য়খণ্ড) এ মন্তব্য করেছেন, "ভারতে ইংরাজ শাসনেব ইতিহাসেই কেবলমাত্র দেখা যায় সে দেশের অর্থ ব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তব ও কুখ্যাত পবীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলা দেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি কবেছে বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল! দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে এমনি নকল করা হয়েছে ছোট ছোট জোতেব আব উত্তব-পশ্চিম ভারতে জমির এজমালী মালিকানা সহ যেসব ভারতীয় অর্থনৈতিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাকে তার নিজেরই অপকৃষ্ট নকলে রূপান্তরিত কবতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।" প্রাক-ব্রিটিশ আমলে মুদ্রায় রাজস্বপ্রদান ছিল কৃষকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ব্রিটিশরা এখন মূল্যের ভিত্তিতে নগদ অর্থদ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করল। যাকে সরকারি কাগজপত্রে বলা হল খাজনা। নগদ অর্থে এই খাজনা প্রদানের জন্য প্রয়োজনে কৃষককে ফসল বিক্রি করা বা তার জমি দান, বন্ধক বা হস্তান্তর করাব অধিকারও দেয়া হল। আসলে কৃষককে এইভাবে মহাজনের গ্রাসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। কৃষকের উপর খাজনার চাপ যত বাড়তে লাগল ততই ঋনের জন্য মহাজনের চড়া সুদের কাছে নিজেকে বিকোতে লাগল। মনেরাখা দরকার এই সুদের হার সাধারণ ছিল না, ছিল চক্রবৃদ্ধি হারে। এই কারণেই আমরা দেখি মহাবিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের পরই মহাজনরা বিশেষ আক্রমণের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাদের ঘরবাড়ী ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহীরা রাস্তা-ঘাট ভর্তি করে দিয়েছিল ছেঁড়া দলিল আর বন্ধকী কাগজে।

মহাবিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র উত্তর ভারতও ব্রিটিশ অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের মত কোম্পানীর নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিল। প্রথমে দেশীয় রাজন্য-বর্গের কাছ থেকে চাপ দিয়ে নজরানা আদায়, তারপরে একই ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়। এই পদ্ধতিতে সুবা বাংলায় ক্লাইভ, হেষ্টিংস প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীরা নবাব মীরজাফর, মীরকাশিম নাজিম-উদ্দৌলার কাছ থেকে বহু অর্থ কোম্পানী ও ব্যক্তিগত স্বার্থে সংগ্রহ করেছিলেন। মাত্র দু'বছরে ক্লাইভের নিজস্ব সম্পদের পরিমান দাঁড়িয়েছিল ১০০,০০০ পাউণ্ডের মত। ১৭৭৫ সালে কোম্পানীর অশ্রিত বারাণসীর রাজা চৈত সিংএব কাছে দাবী কবা হল বাৎসরিক ২,৩৭২,৬৫৬ টাকা। তিন বছর পরে বাড়িয়ে দাবী করা হল বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা। চৈত সিং প্রথম তিন বছরের পব চতুর্থ বছবে দিতে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী হলেন। অনুরক্ত প্রজারা সমর্থনে বিদ্রোহ করলে শক্ত হাতে ইংরেজবা সে বিদ্রোহ দমন করল। ১৭৮০ সালে অযোধ্যার নবাবকে বাধ্য করা হল ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড দিতে। অত্যাচাবের হাত থেকে নবাবের মাতা, পিতামহী ও বেগমরাও নিস্তার পেলেন না। তাঁদেব ব্যক্তিগত বহু মূল্য অলংকারাদি কোম্পানীর কর্মচারীরা জোর করে কেড়ে নিয়ে গেল। নবাবের এই অসম্মান প্রজাদেব বুকেও আঘাত করল।

এদিকে ইংরেজরা চড়া হারে ভূমিরাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখল। যারা পারল না সেই অসহায় কৃষকদের উপর চললো নির্মম অত্যাচার। কোথাও কোথাও একটা ছোট্ট খাঁচায় অনেক লোককে শাস্তিস্বরূপ আটকে রাখা হোত। কৈফিয়ত দেয়া হোত এটা নাকি ভাবতীয়দের কাছে কোনো শাস্তিই নয়! আবার কোথাও এমনও দেখা গেল পিতা অভাবের তাডনায় পুত্রকে বিক্রি করে দিচ্ছে। লোক দলে দলে অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এমন জায়গায় এসে পৌচেছিল। যখন সাধারণ মানুষের সামনে বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

ওদিকে অযোধ্যার নবাব ওয়াজির আলি ইংরাজদের অন্যায় চাপ সহ্য না করতে পেরে বিদ্রোহ করলেন। ইংরাজরা শুধু সে বিদ্রোহ দমন করল তাই নয়, শাস্তিস্বরূপ নবাবকে ১৮০১ সালে এলাহাবাদ এবং আশেপাশের কয়েকটি জেলা প্রদান করতে বাধ্য করল। এগুলিকে বলা হল "Ceded

Districts" (প্রত্যর্পিত জেলা)। নবাবের আমলে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮,৫২৩,৪৭৪ টাকা। সে টাকা তিন বছরের মধ্যে কোম্পানীর উদগ্র লালসায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ১৬,৮২৩,০৬৩ টাকা। মনে রাখা প্রয়োজন নবাব যে পরিমাণ ধার্য করেছিলেন সেটি তাঁর পক্ষে সর্বোচ্চ পরিমাণ এবং তার অনেকটাই অযোগ্য প্রশাসনযন্ত্রের জন্য অনাদায়ী থাকত। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর নির্মম প্রশাসনের হাত থেকে কোনো নিস্তার ছিল না—তাই ব্যর্থতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ১৮০৩ সালে মারাঠা লড়াইয়ের পর আগ্রা এবং গঙ্গা-যমুনার বেসিন বা অববাহিকা ইংরেজদের হাতে এল। এটিকে বলা হল "Conquered Province" বা বিজিত প্রদেশ। এখন প্রত্যর্পিত ও বিজিত এই দু'ধরণের অঞ্চল সমূহ যদি এক সাথে ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে ১৮০৭ সালে ২,০০৮,৯৫৫ পাউণ্ডের মত ভূমিরাজস্ব আদায় হোত। ১৮১৮ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ালো ২, ৮৯২,৭৮০ পাউণ্ড। সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির ভূমিরাজস্ব ১৮৩৪-৩৫ সালে ৪,০১৮,৩৪৪ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৩৬-৩৭ সালে হল ৪,৪৭৮,৪১৭ পাউণ্ড। উত্তর ভারতের খাজনা ধার্য হয়েছিল ১৮৩৮-৩৯ সালে ৪,৫৫৪,৮৯৯ পাউণ্ড। কিন্তু মানুষের দেয়ারও একটা সীমা আছে। জুলুম আর অত্যাচার করে ইংরাজরা ৩,৬৩০,২১৫ পাউণ্ডের বেশি আদায় করতে পারল না।

(দ্র. রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩৬৬-৬৭)

জমিদারবা খাজনা দিতে না পারলে কোম্পানী নিয়ম করল তাদের জমি 'সেলে' (Sale) উঠবে বা বিক্রি হয়ে যাবে। জমিদারদের কাছে জমি অর্থ ছাড়াও সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক ছিল। বেশির ভাগ জমিদারই চড়া হারে খাজনা দিতে অসমর্থ হয়ে জমিদারী ও সম্মান দুই হারলো। চড়া হারে খাজনাধার্যের কারণ তৎকালীন মথুরার কালেকটার থর্ণহিলের মতে "অধিকাংশ তরুন ইংরাজ কর্মচারী দ্রুত প্রমোশনের লোভে বেশি করে খাজনা ধার্য করত।" আদায়ীকৃত খাজনা থেকে সে একটি অতিরিক্ত কমিশন লাভ করত। সুতরাং প্রমোশন এবং কমিশনের লোভে সে যে কি ধরণের অত্যাচার করবে তা' সহজেই অনুমেয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশের রিপোর্ট থেকে জানা যায় একজন ইংরাজ কালেকটারের মোট মাহিনা যদি বছরের হিসেবে হোত ১২০০ পাউণ্ড তবে রাজস্ব আদায়ের অর্থের উপর তার প্রাপ্য কমিশন নিয়ে মোট অংকটা বছরে দাঁড়াত ৪০,০০০ পাউণ্ড। এটা না বললেও চলে

যে অধিকাংশ জমিদার এই বাড়তি খাজনা দিতে অসমর্থ হয়েছিল। একদা বর্ধিষ্ণু সীতাপুরের জমিদাররা কোনো রকমে বাড়ীর গহনাপত্তর বিক্রি করে নিজেদের ভিটেটুকু বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। বাদাউনের জমিদারদের আর্থিক দুর্দশার বিবরণ ওখানের ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়াম এডোয়ার্ডসের রিপোর্টই থেকে জানা যায়। খাজনা দিতে না পারার অভিযোগে অনেক বৃহৎ জমিদার, তালুকদার কেবলমাত্র বাৎসরিক সামান্য বৃত্তিভোগী প্রজায় পরিণত হয়েছিল। বেনিয়ারা তাদের জমি কিনে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্রোহের মাধ্যমে এই শ্রেণীর জমিদার, তালুকদাররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করেছিল। মনে রাখা দরকার এই কারণেই মহাবিদ্রোহের সময়ে ইংরাজরা যখন দমন কার্যে পুরোপুরি লিপ্ত হয়ে পড়ল তখন সাহায্যকারী হিসেবে অধিকাংশ জমিদার ও তালুকদাররা আর এগিয়ে এল না। (কর্ণওয়ালিশের রিপোর্ট ; রামকৃষ্ণ, পৃ. ৩৫৫ , সেন, পৃ. ৩৩) শুধু ভূস্বামীরা নয় গ্রামের বংশানুক্রমিক চৌকিদার 'পাসি'রাও কোম্পানীর নতুন বরকন্দাজ নিয়োগের ফলে তাদের জীবিকা হারাতে বসল। উল্লেখ্য, মহাবিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌ এর ওয়ালি বিবজিস বাদের বিদ্রোহে যোগদানের জন্য যাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 'পাসি'রাও ছিল অন্যতম। (সেন, পৃ. ৩৫)

১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী গঠন করলেন 'ইনাম কমিশন'। উদ্দেশ্য, বেআইন নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত কবা। প্রাক-ব্রিটিশ আমল থেকে বহুব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানাকারণে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর জমি ও কোথাও কোথাও পুরো গ্রাম পুরস্কার হিসেবে ভোগ করে আসছেন। কিন্তু যখন প্রমাণাদি পেশ করতে বলা হয় তখন সংগত কারণেই ব্যর্থ হলেন। কারণ বহু পুরোনো জীর্ণ দলিল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হয় ছিঁড়ে গেছল, নয় হারিয়ে গেছল আর কোথাও কোথাও পোকায় সম্পূর্ণ কেটে দিয়েছিল। তবু কোম্পানী প্রমাণ না থাকার ধুয়া তুলে বহু নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করল। ফলে রাতারাতি অসংখ্য পরিবার, প্রতিষ্ঠান, হিন্দু, মুসলমান, পণ্ডিত, মুল্লা, চাষী—পথের ভিখিরি হয়ে পড়ল। ৩৫,০০০ একর জমি পরীক্ষা করে ২১,০০০ একর জমিই বাজেয়াপ্ত করা হল। কেবল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীরই আয় বৃদ্ধি পেল পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। শুধু সাধারণ মানুষ নয় এমনকি অভিজাতরাও যাদের কোম্পানী ভাতা দিতে চুক্তিবদ্ধ ছিল তাদেরও ভাতা অন্যায় ভাবে বন্ধ করে দিল।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের নেতা ডিসরেলী পর্যন্ত তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "এ হল নতুন এক উপায়ে বাজেয়াপ্তি, কিন্তু অতি ব্যাপক, চাঞ্চল্যকর ও স্তম্ভিত করার মতো আয়তনে।" (মার্কস-এঙ্গেলস, পৃ. ৫৪)

কবি "শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন" বললেও ইংরেজদের কথা সযত্নে বর্জন করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ থেকে মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর কাটিয়েও তারা পুরো বিদেশীই থেকে গেছল। এদেশবাসীর সাথে একাত্ম হওয়ার তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না রাসেল সাংবাদিক হিসেবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেছেন যে শাসক আর শাসিতের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই—কী ভাষায়, কী ধর্মে আর কী জাতীয়তায়। ভারতীয়দের সম্পর্কে এক ইংরেজ মেজর তাঁকে তীব্র ভাষায় বলেন, "এই সব নিগারেরা কুঁড়ে, কামুক······মনে হবে সব শূয়োর ছানা!" রাসেলের দৃষ্টি থেকে সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ অর্থাৎ বর্ণবৈষম্য এড়ায়নি। (ধরমপাল, পৃ. ৩-৫) ভারতবাসীদের সম্পর্কে এই যদি ইংরেজদের মনোভাব হয় তাহলে অপর পক্ষেরও দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয় প্রীতির হবে না। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার এটা বুঝতে পেরেছিলেন "এদেশের লোকেরা বাস্তবে আমাদের পছন্দ করে না।" (ফ্রিডম. মুভ. পৃ. ২৩১) বস্তুতঃ ইংরেজরা ভারতে তাদের এক স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে নিয়েছিল। একটা দ্বীপের মত—যেখানে কোনো ভাবতীয়ের প্রবেশ অধিকার ছিল না। মেলামেশার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আর যে সব সাহেব পাদ্রীরা এসেছিলেন মেলামেশা করে এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে, তাদেব দাম্ভিক ব্যবহার, কটূক্তি, অন্য ধর্মকে নস্যাৎ করার জন্য গালি গালাজ অনভ্যস্ত ভাবতীয়দের চোখে উদ্বেগের কারণ হয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দু বা মুসলমানরা মন্দির-মসজিদেই ধর্মপ্রচার শুনতে অভ্যস্ত কিন্তু প্রকাশ্যে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ভগবান যীশুর গুণ কীর্তন ভজনা তাদের কাছে এক ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা। খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা' সুস্পষ্ট ভাবে ১৮৫৮ সালে রেভারেণ্ড উইলিয়াম ব্রোক লিখে গেছেন। তাঁর মতে খৃষ্টধর্মের প্রকৃত নম্রতা ও শক্তির জন্য দেশীয় সম্প্রদায়কে তা' পরীক্ষা করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। রেভারেণ্ড সাহেব সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে সরকার যেন তাদের পথে কোনো প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি না করেন। অবশ্য পাদ্রী মহোদয়ের সে আশংকার কোনো কারণ ছিল না। জেনারেল হ্যাভলকও লেঃ কর্ণেল হুইলারের মত ধার্মিক

সামরিক অফিসাররা সৈনিক ব্যারাকগুলিতে উপাসনার জন্য চার্চ তৈরী করেছেন, বাইবেল বিতরণ করেছেন আর সর্বোপরি একের পর এক সিপাহীকে খৃষ্টধর্ম ধর্মান্তরিত করেছেন। (ব্রোক, পৃ. ২-৩; ৭ এবং ফ্রিডম, মুভ. পৃ. ২২৯)

শুধু সেনানায়করা নন, অসামরিক প্রশাসন ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে ব্যাপারটি যে নিছক ধর্মীয় ছিল না, পুরো রাজনৈতিক এটা বেশ বোঝা যায়। এই কারণেই আমরা দেখি মাদ্রাজের গবর্ণর তাঁর রিপোর্টে হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জরুরী প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৫৫ সালে জনৈক মিঃ এডমণ্ড কলকাতা থেকে কতকগুলো প্রচারপত্র বিলি করেন। যদিও এগুলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিলি করা হয়েছিল তবে তার আসল লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমলারা। প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল যখন সরকার এক রেলপথ, এক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে ঐক্যবদ্ধ করছেন তখন প্রয়োজন একটি ধর্মের। সেটি হল খৃষ্ট ধর্ম। স্যার সৈয়দ আহমদ, যিনি সে সময়ে উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন তিনি লিখছেন, এই প্রচারপত্রগুলো জনসাধারণকে আতংকিত করেছিল। এ ছাড়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি সুযোগ সুবিধা বেশি করে মিলতো। অনুমান করা যায় যে ইংরাজরা মনে করত এদেশের যত বেশি লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে তত বেশি সংখ্যায় তাদের অনুগত প্রজা বৃদ্ধি পাবে। সুরেন্দ্রনাথ সেন মনে করেন যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের মধ্যে একটা রাজনৈতিক মতলব ছিল। "কারণ শাসক আর শাসিতের মধ্যে এতদিন যে ঐক্যের অভাবটি ছিল তা' আশা করা গেছল খৃষ্টধর্ম পূরণ করতে পারবে।" (সেন, পৃঃ ১০) ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস ইংরাজদের সে আশা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে কিন্তু ঐতিহাসিক তাৎপর্যজনক নীরব। একই প্রসঙ্গে প্রমোদ সেনগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতি কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন কিন্তু ভ্রান্ত বলেননি। (সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৮) ফলে ভারতীয় খৃষ্টানদের সম্বন্ধে একটি বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজদের যে আশার কথা উল্লেখ করেছেন পরবর্তী ইতিহাস তা' পূর্ণ করেনি। যদিও এখানে-ওখানে কিছু ব্যতিক্রম ছিল নিশ্চয়। যেমন ফতেপুরের ডেপুটি কালেকটার হিক্রমতুল্লাখাঁকে মৃত্যুদণ্ড

দেয়া হয়েছিল জেলা জজ রবার্ট টাকারকে হত্যা করার অভিযোগে। ব্রোক সানন্দে জানাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কিছু দেশীয় খৃষ্টান হিক্রমতুল্লাখাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। (ব্রোক, পৃঃ ১৬৪) স্মরণ করা যেতে পারে মহাবিদ্রোহের মাত্র আটাশ বছরের মধ্যে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যিনি সভাপতি হন সেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন দেশীয় খৃষ্টান। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে স্যার সৈয়দ আমেদ খাঁ অন্ততঃপক্ষে বিশজন ইংরেজের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। হিন্দু জমিদার হরদেও বকস গোপনে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাদাউনের ম্যাজিষ্ট্রেট উইলিয়াম এডোয়ার্ডসকে। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই, মিশনারী ও সরকার তরফে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে অত্যুৎসাহীতা। উত্তর প্রদেশেব মত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে জনসাধারণের মনে তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্বেষের সঞ্চার কবেছিল। ১৮৫৭ সালেব ১০ই জুন লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় একটি সংবাদ বেরোয়। তাতে বলা হয় ভারতীয়দের ধারনা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামাবষ্টোনের কাছে প্রতিজ্ঞা করে ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছেন যে তিনি তাঁর সাধ্যমত এ দেশেব সবাইকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবেন। মহা-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এক সংবাবদাতা ১লা মে, ১৮৫৭ সালে কলকাতার 'দি ইংলিশম্যান" পত্রিকায় লিখছেন, "এ দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের ধারনা হয়েছে যে তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হবে। দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে আবাব সবচেয়ে বেশি করে এই ভুল ধারনাটি বিরাজ করছে।" ইংরাজ সাংবাদিকের পক্ষে "ভুল ধারনা" বলাই স্বাভাবিক কিন্তু যাঁর চোখে সিপাহীদের সামান্য ত্রুটীও ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে সেই রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত বলেছেন এই আশংকা ছিল খুবই বাস্তব এবং বহু বিস্তৃত (" were real and very widely spread ")। যে চৌত্রিশ নম্বর নেটিভ ইনফেন্টি্র প্রথম বিদ্রোহ করেছিল তারা প্রায় নিশ্চিত ছিল যে তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হবে। (ফ্রিডম মুভ. পৃঃ ২৪৫, ফুটনোট) ১৮২৫ সালে বেঙ্গল রেজিমেণ্টের এক কর্ণেল জানাচ্ছেন, "আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি সিপাহী এবং অন্যান্যদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কোনো চেষ্টা করেছি কি না? এর উত্তরে আমি সবিনয়ে জানাতে চাই যে এটিই আমার উদ্দেশ্য এবং আমি মনে করি ঈশ্বর ভক্ত প্রতিট খৃষ্টানেরও এটিই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।" (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ২৯)

প্রশ্নটা হিন্দু-মুসলমানের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রলোভন ও বল-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মের স্বাধীকার রক্ষা—নিছক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়। মনে রাখা দরকার মহাবিদ্রোহের সময়েই এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গাঙ্গেয় পরগণার অপর পারের বিদ্রোহের কারন বলতে গিয়ে ধর্মকে হেতু হিসেবে নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "Religion had little or nothing to do with it" (মজুমদার, পৃঃ ৪৯৮)। ১৮৩৭ সালে দুর্ভিক্ষ হল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে। অন্নের প্রলোভন দেখিয়ে বহু অনাথ শিশুকে খৃষ্টান করা হল। ফতেপুরে জেলে কয়েদীদের জোর করে খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেয়া হল। (গুপ্ত, পৃঃ ৩২) পিটার হার্ডি বলছেন উনিশ শতকের গোড়াতে মুসলমানদের আপত্তি সত্ত্বেও কোম্পানী শরিয়তি আইন বাতিল করে নিজস্ব ফৌজদারী আইন চালু করল। ফলে সারা উত্তর ভারতকে দিল্লীর শাস্ত্রজ্ঞ আবদুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৫) 'দার-উল-হারব' বা বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। (হার্ডি, পৃঃ ৫১) আবার যে হিন্দু সন্তান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে পরিবারের সামাজিক সেবা কার্যে অনুপস্থিত থাকল তাকেই নতুন ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনে (অ্যাক্ট ১২নং, ১৮২০) পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তির অধিকার দেয়া হল। (সেন, পৃঃ ১২) সুতরাং ব্যাপারটি যে নিছক ধর্ম ছিল না—তা' হেনরী ডডওয়েলও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তার মতে ডালহৌসীর কয়েকটি সামাজিক সংস্কার ব্যতীত "কেবলমাত্র ধর্মের কারনে হিন্দুরা আমাদের বিপক্ষে যায়নি।" ("……Were not antagonistic to the Government on the score of religion" Dodwell ; P. 169) আসলে ভারতে প্রাচীন ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহ্য একটি সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা। কারণ ধর্মান্তরকরনের ব্যাপারটি কখনোই এদেশে মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়নি এবং তা' কোনোদিন জাতীয় আলোড়নও সৃষ্টি করেনি। অন্ততঃ পক্ষে প্রাক-ব্রিটিশ পর্বে। মহাবিদ্রোহ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে ১৬০৩ সালে সম্রাট আকবর জেসুইট পাদ্রীদের এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও দীক্ষিত করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (শ্রীবাস্তব, পৃ. ৩৬) এই স্বাধীনতার সুযোগ তাঁরা শুধু অবাধে নেননি—এমনকি এক সময়ে ফাদার মনসারেটের মনে হয়েছিল তিনি হয়ত স্বয়ং সম্রাটকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হবেন! মধ্য-যুগের ভারতে এমন কোনো প্রমান পাই না যেখানে রাষ্ট্র ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার আয়োজন করছে। সে রকম কিছু ঘটলে

তদানীন্তন গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সানন্দে এবং অতিরঞ্জনের সাথে তা' লিখে যেতেন। ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে হয়ত রাজনৈতিক কারনে কিছু হয়েছে এবং সে জন্যেই বিশেষ উল্লেখ্য প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এমন কি আওরঙজেবের সময়েও সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়নি। মৌর্যরাজা অশোক স্বয়ং বৌদ্ধ হয়েও দ্বাদশ শিলালিপিতে আদেশ দিচ্ছেন। "অন্য ধর্মগোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।" রমেশচন্দ্র মজুমদার যাঁর দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক ঘটনার উপর খুবই তীক্ষ্ণ তিনি ও স্বীকার করেছেন যে উনিশ শতকের গোড়ায় সাধারণ ভাবে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো প্রকার বিদ্বেষ মনোভাব ছিল না এবং একের কাছে অন্যের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল। (ফ্রিডম. মুভ. পৃ. ৩২) সুতরাং বোঝাই যায় ধর্মীয় জবরদস্তির যে রূঢ় অভিজ্ঞতা এতদিন হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ভাবে ছিল না তাদেরই এখন বিস্মিত ও আতঙ্কিত করল খৃষ্টান শাসক সম্প্রদায়ের অত্যধিক ধর্ম প্রীতি ও প্রচার। তারা লক্ষ্য করল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের পেছনে এইসব শাসকদের সক্রিয় সাহায্য উত্তেজকের কাজ করছে। সৈন্য বাহিনীর মধ্যে জেনারেল হ্যাভলকের ধর্মপ্রচারে খুশী হয়ে ১৮৩৫ সালে গবর্নর জেনারেল চার্লস মেটক্যাফ বলেই ফেললেন, "I only wish that the whole regiment was Baptist." (ব্রোক, পৃ. ৪৫) লেঃ গবর্ণর অবশ্য সরকারি ভাবে ঘোষণা করলেন যে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মে আঘাত দেয়া বা ধর্মান্তরিত করনের কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা এই সরকারি আশ্বাসের উপর কিভাবে ভরসা রাখবে? তাই অবাক হওয়ার থাকে না যখন দেখি এসব সত্ত্বেও পাটনা প্রোভিন্সের মুসলমানরা সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

মহাবিদ্রোহের ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একটি কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলেই হিন্দু-মুসলমান তাদের তথাকথিত গোঁড়ামীর জন্য (যা' সেনের ভাষায় "Orthodox masses") ইংরেজ বিরোধী হয়ে পড়েছিল। গ্রামাঞ্চলে উঠেছিল ডাক—সেনের মতে "Religion in danger" বা ধর্ম আক্রান্ত। (সেন, পৃ. ১৬)। কিন্তু বিপদটা এখানে সীমাবদ্ধ অর্থে ধর্মের বলে ব্যাখ্যা করলে হিন্দু-মুসলমানের শত শত বছর ধরে গড়ে তোলা ধর্মীয় সহনশীলতার ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করতে হয়—যা' ইতিহাস সম্মতও নয়। প্রতুল গুপ্ত বলছেন উনিশ শতকের গোড়ায় এদেশের লোক মিশনারীদের কাণ্ড কারখানা দেখে কৌতূহল এবং কৌতুক বোধ করত

কিন্তু কোনো বিদ্বেষ পোষণ করত না। তাঁর মতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মিশনারীদের কাজকর্মের বাড়াবাড়ি এবং সরকারি অফিসাদের খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে ভূমিকা সরকারেব পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (গুপ্ত, পৃ. ৩২) কিন্তু কেন "সরকারের পক্ষে লজ্জার কারণ" হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার কোনো ব্যাখা দেননি। তবে স্পীয়ার স্বীকার করেছেন যে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের চাপে হিন্দু মন্দির এবং উৎসবে সবকাবেব দেয় অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। (স্পীয়ার, পৃ ১৩০) আসলে হিন্দু-মুসলমানের কাছে সমস্ত ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মীয় গোঁড়ামীব উর্দ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার বক্ষাব প্রচেষ্টা। ১৮০৬ সালে মাদ্রাজের ভেলোরে সিপাহীরা বিদ্রোহ কবল। অসন্তোষেব কারণ, মাথায় পাগড়ীব বদলে চামড়ার টুপি পরতে হবে। কপালে ধর্মীয় তিলক আঁকা নিষিদ্ধ আব বাধ্যতামূলক দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে। এগুলোর কোনোটাই উপাসনা পযায়ে পড়ে না—দীর্ঘকালেব বীতি নীতি আর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। মহাবিদ্রোহের শেষেব দিকে মহাবাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র (১৮৫৮ সালেব ১০ই নভেম্বব) জারী হল ভারতীয়দের আশ্বস্ত করে আর তার প্রত্যুত্তরে বিরজিস কাদেবের নামে অযোধ্যার বেগম হজরত মহল ১৮৫৮ সালেব ৩১শে ডিসেম্বব জনসাধাবণকে উদ্দেশ্য কবে যে ঘোষনাপত্র জাবী করেছিলেন তা' পাঠ করলেই বোঝা যায় তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের কাছে "ধর্মের বিপদ" বলতে কি প্রকৃতপক্ষে বুঝিয়ে ছিল। হজরত মহল বলছেন, "ঘোষণাপত্রে (ভিক্টোরিয়ার) লেখা হয়েছে খ্রীষ্ঠধর্ম সত্য কিন্তু অন্য কোনো ধর্মের উপর অত্যাচার ঘটবে না এবং সবাব প্রতিই আইনের সুবিচার হবে। সত্য অথবা ধর্মের মিথ্যার সংঙ্গে সুবিচার প্রদানের কি সম্পর্ক আছে? সেই ধর্মই সত্য যা' স্বীকার করে এক ঈশ্বর এবং অন্য কাউকে নয়। যখন ধর্মে তিন ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে তখন মুসলমান, হিন্দু এমনকি ইহুদী, সূর্য উপাসক অথবা অগ্নি উপসেকেরা এবে সত্য বলে মানতে পারে না। যখন শূকর ভক্ষণ, মদ্যপান, চর্বি মেশানো টোটা চর্বন এবং গম ও মিষ্টির মধ্যে শূকরের চর্বি মেশানো চলছে, যখন রাস্তা তৈরীর নামে হিন্দু-মুসলমানের ভজনালয়গুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে, যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীদের অলিতে-গলিতে পাঠানো হচ্ছে,—তখন কিভাবে জনসাধারণ বিশ্বাস করবে যে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ হবে না? বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে এবং যার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। আমাদের প্রজারা কোনো মতেই

বিভ্রান্ত হবে না; উত্তর-পশ্চিমে হাজার হাজার লোক তাদের ধর্ম খুইয়েছে এবং আরো কয়েক হাজার ধর্ম পরিত্যাগ করার চেয়ে বরং ফাঁসীর দড়িকে বরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছে।" (সেন, পৃ. ৩৮২-৮৪)

ভারতীয় সংস্কৃতির জাজিমটি এত সংকীর্ণ ছিল না যে তাতে খ্রীষ্টধর্মের সংস্কৃতির নকশাটি মিল-মিশ যেত না। কিন্তু যেখানে ধর্ম সত্যপীরে'র রূপে ধরা দেয় না, দেয় না ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে—যেখানে কোনো রাজকুমার দারাশিকো হ'র মত উপনিষদ আর কোরানের মধ্যে সমন্বয়ের সন্ধান করেন না, যেখানে কেবল ধর্ম মানে বল প্রয়োগের রাজহুমকী আর ধর্মপ্রচারকের কুৎসার ছবি ফুটে ওঠে সেখানে ধর্মের প্রকৃত অর্থ ভালবাসা চাপা পড়ে জেগে ওঠে সন্দেহ তার বিদ্বেষ। পার্শিভ্যাল স্পীয়ারের মতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার সরকাবের আনুকূল্য লাভ করেছিল, যা' ভারতীয়দের চোখে প্রতীয়মান হয়েছিল সরকারি সমর্থন। ফলে মহান মুঘলদের মত ব্রিটিশ সরকার আর তাদের কাছে নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব বলে ধরা পড়েনি। " ....So that the government came to be associated no longer with the idea of neutral authoritiy (like improved Mnghals.) অবশ্য স্পীয়ার এরপরই মন্তব্য করেছেন যে "ভারতীয়রা বিশ্বের মধ্যে সবচে বেশী রক্ষণশীল জাত"। (স্পীয়ার, পৃ. ১৩৯)

১৮৭৫ সালের মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে স্পীয়ারের ভারতীয়দের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে যে রায়দান তার সাথে তৎকালীন য়ুরোপের রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের বা ইংলণ্ডের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মের রক্ষণশীলতার কতটা তফাত ছিল সে আলোচনার মধ্যে না দিয়েও বলা যায় একথা সুবিদিত যে ভিক্টোরিয়ার আমলের সামাজিক রক্ষণশীলতা কোনো ভাবেই এদেশের চেয়ে কম ছিল না। আর ধর্মীয় রক্ষণশীলতা সম্পর্কে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসের সুপরিচিত পণ্ডিত ট্রেভেলিয়ানের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মপ্রচারক বা ইভানজেলিষ্টদের গোঁড়ামিকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের কথা স্মরণে রেখে তিনি বলছেন অন্যথা দেশ এ সময়ের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অবহেলার সুযোগ নিয়ে বৈপ্লবিক হিংসার পথ ধরত। ট্রেভেলিয়ান তাঁর সপক্ষে ফরাসী ঐতিহাসিক যিনি ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসের একজন বিশেষজ্ঞ সেই এলি হালেভি (Elie Halevy)র উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হালেভি

পরিষ্কার ভাবে মন্তব্য করেছেন। "Evangelicalism was thus the conservalive force" বা এক রক্ষণশীল শক্তি। আর এই গোঁড়া ধর্ম-প্রচারক বা ইভানজেলিক্যালদের আওতায় সমগ্র ইংলণ্ডের জনসাধারণ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে এসেছিল। ট্রেভেলিয়ানের মতে সে সময়ে ইংলণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক বলতে তাঁকেই বোঝাতো যিনি একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা ইভান-জেলিক্যাল। "এঁদের সৈনিকরা শ্রদ্ধা করত আর ভারতবর্ষ ভয় এবং কৃতজ্ঞতার চোখে দেখত।" ভারতবর্ষের "কৃতজ্ঞতা"র কি কারণ আমাদের জানা নেই তবে "ভয়" যে পেত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ স্পায়ার স্বীকার না করলেও ট্রেভেলিয়ান সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে সিভিল সার্ভিসে এবং ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় উনিশ শতকের প্রথম চল্লিশ বছর এই শ্রেণীর লোকেরা ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

(সোস্যাল হিষ্ট্রি, পৃঃ ৪৭৭ এবং ৪৯৫)

সুতরাং খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে ভারতীয়দের আশংকা অজ্ঞতা ও অশিক্ষা প্রসূত ভয়ের উপর কেবল নির্ভরশীল ছিল না—ছিল এর বাস্তব ভিত্তিও। ব্রোক বলছেন একজন ইভানজেলিক্যাল হিশেবে ১৮৪০ সালে হ্যাভলক তাঁর অধীনস্থ রেজিমেণ্টের অনেককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন ("‥ The apparent conversion of many to the faith of Christ.")

মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে অধিকাংশ ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা একমত যে, বেন্টিংক থেকে ক্যানিং এর (১৮৩৩-১৮৫৬) আমল পর্যন্ত যে সব সামাজিক সংস্কার ইংরাজরা প্রবর্তন করেছিল তা' সাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয়দের কাছে মনে হয়েছিল ধর্মীয় রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ। পিটার হার্ডির মতে ব্রিটিশদের চিন্তা করা উচিত ছিল তারা ভারতীয় রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করবে কিনা? তাঁর মতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনও একটি করেন।

বিধানচন্দ্র ইংরাজ প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারগুলোর একটি তালিকা দিয়েছেন। যেমন, গঙ্গায় শিশুকন্যা নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ (১৭৯৫), সতীদাহ প্রথা নিবারণ (১৮২৯) এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন (১৮৫৬)। ডড ওয়েল, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের বক্তব্যও তাই।

মনে রাখা প্রয়োজন, শিশু কন্যা নিক্ষেপ নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথেই যে ফলপ্রসূ হয়নি সে কথা রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্বীকার

করেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে বিশ শতকের গোড়ায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচলিত হওয়ার পর। মজুমদারের মতে গোপনে শিশু-কন্যা হত্যার ঘটনাকে নির্ণয় করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আইনটি যে আদৌ কার্যকরী হয়নি তার প্রমাণ মহাবিদ্রোহের তেরো বছর পরে ১৮৭০ সালে নতুন করে আরো কঠোর শর্তসহ আট নম্বর আইন সরকারকে পাশ করতে হয়। (দ্র. অ্যাডভান্স হিষ্ট্রি, পৃঃ ৮২২ এবং ডড ওয়েল, পৃঃ ১১৩)

সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন চালু হয়েছিল ১৮২৯ সালে। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে এই প্রথা সাধারণ মানুষের কাছে কখনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠেনি। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুশাসনের গ্রন্থ "মনুস্মৃতি"তে সতীদাহের কথা বলা হয়নি। এমন কি ইংরাজরা তাকে "Gentoo Code" বলে সেই হিন্দু নিয়মাবলীতেও বলা হয়েছে সহমরণে না গেলে একজন বিধবাকে কেবল শুদ্ধাচারিণীর জীবনযাপন করতে হবে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সুপণ্ডিত এ. এস. আলতেকার সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দু-মুসলমানের আমলে সতীদাহের সংখ্যা ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের প্রথম ভাগের চেয়ে কখনো বেশি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে অতীতে ত্রুটি কোনো বৃহৎ সামাজিক অভিঘাতও সৃষ্টি করেনি। (আলতে-কারের মন্তব্য ; দ্র. রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩২৪) তাই মধ্যযুগে সম্রাট আকবরকে দেখি মুসলমান হয়েও বিনাবাধায় সতীদাহের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে। ১৫৬১ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন সেই গড়-কাটাঙ্গার রাণী চান্দেল্য বংশীয়া দুর্গাবতী এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি হোলকার রাজ্য যিনি সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে টিকিয়ে রেখেছিলেন (১৭৬৬-১৭৯৫) সেই অহল্যাবাঈ উভয়েই ছিলেন বিধবা। আর একথা তো সুবিদিত মহাবিদ্রোহের শেষের দিকে যিনি লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিধবা হয়েছিলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে সতীদাহ কোনো বাধ্যতামূলক প্রথা ছিল না বা সমাজের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল বিধবার জীবন-যাপনে। লক্ষ্যনীয়, মহাবিদ্রোহের কোনো হিন্দু নেতার পরিবর্তে বিষয়টির প্রতি ফলাও করে দৃষ্টি আকর্ষণ করান রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহী নবাব খাঁন বাহাদুর খাঁ। অযোধ্যায় রাজপুতদের সাহায্য নিশ্চিত করার জন্যই তিনি তাঁর ঘোষণাপত্রে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইনের উল্লেখ করেন। অবশ্য রাজপুতরাও তাঁকে

স্মরণ করিয়ে দিতে পারত কিভাবে একদা সম্রাট আকবর রাজা ভগবানদাসের ভাইপো জয় মলের বিধবা স্ত্রীকে স্বয়ং চিতার উপর থেকে উদ্ধার করেছিলেন!

বিধবা বিবাহ হিন্দুদের ক্ষেত্রে নতুন কোনো ব্যাপার ছিল না। ঋকবেদের যুগে এবং মৌর্য আমলেও এর প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ শতকেও বিধবা বিবাহ মহারাষ্ট্রের অ-ব্রাহ্মণ এবং পাঞ্জাব ও যমুনা উপত্যকার জাঠদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (এ্যাডভান্স হিষ্ট্রী; পৃঃ ৩২ এবং ৭৫) তাই সাধারণ হিন্দুদের দৃষ্টিতে এটি কোনো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপের ব্যাপার ছিল না।

উল্লেখ্য, যে কোনো সামাজিক সংস্কারের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের উপর। পূর্ব ভারতের কলকাতা শহরে এ ধরণের আন্দোলন কিছুটা গড়ে উঠলেও পশ্চাৎপদ উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীতে প্রায় কিছুই হয়নি বলা যায়। তা'ছাড়া একটি আইনকে সক্রিয় করতে গেলে আইন বলবৎ করার যন্ত্রটিকেও শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু যোগাযোগ ও পরিপূর্ণ পুলিশি ব্যবস্থার অভাবে এই আইনগুলি কখনোই আতংক সৃষ্টির অবস্থায় পৌঁছায়নি। এই বিশ শতকের শেষ পাদেও যখন আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এখানে ওখানে 'সতী'র ঘটনা ঘটে তখন সে আমলে আইন পাশ হওয়ার মাত্র আঠাশ বছরের মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন কতটা সক্রিয় হয়ে জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল—তা' সহজেই অনুমেয়। গ্রামাঞ্চলে আইন বলবৎকারী সংস্কারের দাস চৌকিদাররা সতীদাহ প্রথায় যে কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না একথা বলা বাহুল্য। মনে রাখা প্রয়োজন, একটি আইন পাশ হলেই তা' সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে প্রভাবিত করে না। এটি সময় সাপেক্ষ-ধীরে ধীরে অনুভূত হয়। উল্লেখ্য, মহাবিদ্রোহের মাত্র আঠাশ বছর আগে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন এবং মাত্র দশ মাস আগে বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। যাই হোক, এতৎ সত্ত্বেও এটা খুবই তাৎপর্যজনক যে যাঁরা এইসব সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতার পুরোভাগে ছিলেন, কলকাতার সেই সব উচ্চবর্ণ সামন্ত প্রতিভূ নীলমণি দে, ভবানী চরণ মিত্র এবং রাধাকান্ত দেবের মত সমাজ কুলতিলকরা কিন্তু মহাবিদ্রোহে ইংরাজদের সপক্ষেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপরও যদি ধরে নেয়া যায় গুজবের কান ভারী হয়, তাহলে প্রশ্ন থাকে বৃহত্তর জনসমষ্টির কত অংশকে তা' প্রভাবিত করেছিল? বিশেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেখানে আইনের কড়াকড়ির কোনো প্রমাণ তুলে ধরে না। তা'ছাড়া সাময়িক ভাবে গুজবের উপর বিভ্রান্তশীল মানুষ কোনো দীর্ঘস্থায়ী

জীবন-পণ লড়াইতে নামে না। লক্ষ্যণীয়, মহাবিদ্রোহের সমসাময়িক দু'জন ইউরোপীয়ান লেখক রেভারেণ্ড ব্রোক (১৮৫৮) এবং জি. ও ট্রেভেলিয়ান (১৮৬৫) বিদ্রোহের অন্যান্য কারণ উল্লেখ করলেও তথাকথিত সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে নীরব। একই সঙ্গে এটিও কৌতূহলের বিষয় ১৮৪৮ সালে মহাবিদ্রোহের মাত্র ন'বছর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে বলেছিলেন যে, এতে জনসাধারণ বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়নি। "বাংলার ইতিহাস" লিখতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করছেন, "বহুকাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইযাছে , এই দীর্ঘকাল মধ্যে, প্রজাদিগের অসন্তোষের কোনোও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন ; যদি ইহা ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে, উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহার কোনোও কালে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে, বোধ হয়, প্রত্যয় করিবেক না।" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ , পৃ. ২২১) আবার সত্যই যদি সামাজিক সংস্কার মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্য লাগে সামাজিক সংস্কারের বিধিগুলি বাতিলের কোনো সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যতিরেকেই কিভাবে উত্তর ভারতের তালুকদাররা মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাধারণ মার্জনাকে সম্বল করে (১৮৫৮, ১লা নভেম্বর) মহাবিদ্রোহের মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়াল।

পি. ঈ. রবার্টস, ডড ওয়েল, মাইকেল এডোয়ার্স প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ভারতীয় ইতিহাসবিদরা বলেছেন, রেলওয়ে নির্মানের ফলে চলন্ত ট্রেনের এক কামরায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের যাত্রীদের পাশাপাশি বসার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেন যাকে বলেছেন, "non—observance of Caste distinction" এবং যা' ডডওয়েলের ভাষায় সাধারণের চোখে মনে হয়েছিল "Sorcery was at work" বা ভৌতিক ব্যাপার। মজুমদার অবশ্য অন্যত্র ব্রিটিশ আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, রেল এবং টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কেবল ১৮৫৮ সালের পর। (অ্যাডভান্স হিষ্ট্রি , পৃঃ ৮৯৯) ১৮৪৯ সালে প্রথম কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হয়। ১৮৫৪ সালে তৈরী হয় বোম্বে থেকে থানা

পর্যন্ত। আর ১৮৫৯ সালেও তৈরী হয়েছিল কেবলমাত্র ৪৩২ মাইল। ১৮৫৯ সালে লর্ড রবার্টস তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে "আপকান্ট্রি" বা উত্তর-পশ্চিমে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাণীগঞ্জের পর যানবাহন হিশেবে কষ্টকর বগীগাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী এবং ডুলি ব্যবহার করেছিলেন (রবার্টস ; পৃঃ ৪৫৩)। নিত্য যাতায়াত দূরে থাকুক, রেলপথ তখন সাধারণের যোগাযোগের মাধ্যম হিশেবেই প্রকৃতপক্ষে গড়ে ওঠেনি। লাইনে ট্রেন চললেও সে কি সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে? যখন জানি এই বিশ শতকের শেষেও অনেক পল্লীগ্রাম আছে যেখানের মানুষ আজো রেলপথ চোখেই দেখেনি।

মহাবিদ্রোহের সময়ে টেলিগ্রাফের তার সেই সবেমাত্র সংবাদ পাঠানোর মাধ্যম হিশেবে গড়ে উঠেছে। পি. ঈ. রবার্টস লিখছেন এটির দিকে লোকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। ভাবতো যাদু এবং আরো একটি "diabolical agency" বা ভয়ংকর ব্যাপার—রেলওয়ের মত। (পি. ঈ. রবার্টস, পৃঃ ৩৬৪) লর্ড রবার্টস প্রত্যক্ষদর্শী হিশাবে লিখেছেন ১৮৫৭ সালে টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ছিল খুবই কম। (রবার্টস, পৃঃ ১.৫) যাই হোক, গ্রামের সাধারণ মানুষ ব্যাপারটিকে কি চোখে দেখত তা' বললেই বোধ হয় ভারতীয়দের মনোভাব বোঝা যাবে। কোলিয়ার লিখছেন, অনেক সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া ও টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন থাকত-তার কারণ গ্রামের অনেক পুরুষেরা সেই তার কেটে তাদের বাড়ীর মেয়েদের জন্য বালা তৈরী করে দিত। নিশ্চয় 'যাদু' বা ভয়ংকর কিছু মনে করলে এ জিনিস তারা করত না। (কোলিয়ার, পৃঃ ৫২)

মনে রাখা প্রয়োজন ইংরাজ ঐতিহাসিকদের তরফে মহাবিদ্রোহের এইসব তথাকথিত কারণগুলিকে প্রাধান্য দেয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, সেটি হচ্ছে সমাজ সংস্কারক হিশেবে নিজেদের জাতীর মহত্বের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করা এবং একই সাথে প্রমাণ করা যে ভারতীয়রা অজ্ঞতার কারণে প্রগতিশীল কার্যকলাপের বিরোধিতা করেছিল। যেহেতু এই সব ঐতিহাসিকরা মহাবিদ্রোহের পরে পরেই তাঁদের বই লিখেছিলেন তাই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিচালিত হয়ে তাঁরা স্বদেশে ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে চাইলেন ভারতবাসীকে মধ্যযুগের পরিবেশেই রাখা মঙ্গল। কারণ মহাবিদ্রোহের ভেতর দিয়ে ভারতবাসী প্রমাণ করেছে তারা তাই চায়! অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন রাখলে শোষণের যন্ত্রটিকেও অব্যাহত

রাখার সুবিধা ঘটবে। বস্তুতঃ মহাবিদ্রোহের পর ইংরাজরা কিছুদিনের জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাত দেখিয়ে নানা' রকম প্রগতিশীল আইন প্রণয়নে অসম্মতি প্রকাশ করল। আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার ইংরাজদের এই সব অজুহাত দেখাতে সাহায্য করল অভিজাত বংশীয় ধর্মের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ, রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ইংরাজ বাহিনীতে সর্বোচ্চ ভারতীয় পদের অধিকারী সুবাদার সরদার বাহাদুর হেদায়েত আলী অথবা সুবাদার সীতারাম প্রমুখ ব্যক্তিরা। এর কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে হিন্দু-মুসলমানের উচ্চ-বিত্ত সমাজে সামাজিক রক্ষণশীলতার যতটা পচন দেখা গেছল ততটা নীচুতলার মানুষের মধ্যে স ক্রামিত হয়নি।

মহাবিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে পিটার হার্ডি প্রশ্ন তুলেছেন ব্রিটিশদের শাবা উচিত ছিল তারা ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করবে কিনা—তার কথায়" Whether they should introduce English education in English." এর অর্থ ইংরাজী শেখাতে গিয়েই বিদ্রোহের হেতু তৈরী করা হয়েছিল। (হার্ডি, পৃঃ ৬১) ডডওয়েল বলছেন একমাত্র বাংলা দেশের হিন্দুদের ছাড়া আর মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি মহাবিদ্রোহের পরে খুবই মন্থর ছিল। সবচে'মজার কথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ২১, ৬৭০, ১৬৭ জনের মধ্যে মাত্র স্বাক্ষর জ্ঞানের অধিকারী ছিল এ সময়ে কেবল ৬৪, ১৩৫ জন। (ডড ওয়েল, পৃঃ ১৬৬) সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার হাল কি ছিল তা' সহজেই বোঝা যায়। ঐতিহাসিককেহ ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনকে বিদ্রোহের কারণ হিশেবে সরাসরি দাবী করেননি—তিনি দাবী করেছেন সরকারের শিক্ষা নীতির। যে নীতির ফলে মুসলমান মৌলভীদের মর্যাদা ও আর্থিক মঞ্জুরী হ্রাস পেয়েছে। তিনি সমালোচনা করেছেন মিশনারীদের এ ব্যাপারে সাহায্য নেয়ার জন্য। " ·relying partly on missionary aid was in fact a challenge to Brahmanism and that the tendency of educatonal measures from 1835 onwards had been to curtail Muhammadan emoluments and Muhammadan dignity." (কেইর মন্তব্য, দ্র. ডড ওয়েল, পৃঃ ১১৯) তা' ছাড়া সৈয়দ আহমেদ খাঁ মহাবিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে যে আবেদন লিপি ইংরাজ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা

প্রবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং মহাবিদ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছর তাঁর সক্রিয় প্রযাস ছিল উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর সন্নিকটস্থ স্থানগুলিতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের। প্রতুল গুপ্তের মতে ১৮৫৭-র আগে যে সব ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল সেগুলি মোটেই জনসাধারণের বীতরাগের কারণ হযনি। বেনারসে জযনারাণ ঘোষালের চেষ্টায় এবং কানপুরে বাজীরাওয়ের দেওয়ানের উদ্যমে ইংরাজী বিদ্যালয় খোলা হযেছিল। (গুপ্ত, পৃঃ ৬১)।

মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিকরা লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে প্রথম আফগান যুদ্ধের (১৮৩৯-৪২) উল্লেখ করেছেন। বিপর্যস্ত কোম্পানীর সৈনিকরা ফেরার পথে আফগানদের হঠাৎ আক্রমণে দারুণভাবে হতাহতের সম্মুখীন হয। সেদাযেত আলী এবং সীতারাম উভয়েই জানান যে হিন্দু সিপাহীরা বাধ্য হযে মুসলমান সিপাহীদের কাছ থেকে আহার্য গ্রহণ করেন। ফলে দেশে ফিরে তারা জাতিচ্যুত হন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সমগ্র ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায পরবর্তীকালে তারা হিন্দু সিপাহীদের আক্রোশের কারণ হয। (সেন , পৃ. ৮) আফগান যুদ্ধে হিন্দু সিপাহীদের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ঘটনা হিসেবে সত্য হলেও তা' দের শুধু এই আহার্য ও পানীয় গ্রহণের জন্য কতটা ইংরেজ বিরোধী করেছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে জরুরী পরিস্থিতিতে এধরণের ঘটনা কোনো অস্বাভাবিক নয। ঐতিহাসিকেরা সবাই স্বীকার করেন যে ফৌজে যোগদানকারী সিপাহীদের পেশা ছিল বংশানুক্রমিক। অতীতে তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা একদা মুঘলবাহিনীতে এবং সঙ্গে মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিযে লড়াই করেছিলেন। কারণ মুঘলবাহিনী ছিল মিশ্র রেজিমেণ্ট। এতে থাকত তুরানী, হিন্দুস্তানী (ভারতীয় মুসলমান) এবং রাজপুত। বলা বাহুল্য মুঘলবাহিনীতে যোগদানকারী রাজপুতদের সামাজিক অভ্যর্থনা সাধারণ রাজপুত তথা হিন্দু পরিবারে কোনো দিনই হার্দ্য ছিল না। অম্বরের রাজা মানসিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি মুঘল সেনানাযকদের রাজপুতরা ভযে সম্ভ্রম দেখিয়েছে কিন্তু মর্যাদা দেয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক বর্জনেরও সম্মুখীন হযেছেন। কিন্তু এ কারণে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে রাজপুতদের যোগদানে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি—বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। তা' ছাড়া আফগান লড়াইতে হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের এ ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতাও এই প্রথম নয়। ১৩৮৬ সালে আকবরের অন্যতম সুহৃদ রাজা

বীরবলের নেতৃত্বে যে বাহিনী প্রেরিত হয় সে বাহিনী খাইবার উপত্যকার কাছে দুর্দান্ত উপজাতিদের আক্রমণে সমূলে বিনষ্ট হয়। রাজা নিজেও নিহত হন। আবার মহাবিদ্রোহের দু'শো বছর আগে ১৬৪৬-৪৭ সালে আফগানিস্তান পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় বলখ দখলের জন্য শা'জাহান যে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন তার মধ্যে একদল রাজপুত সৈন্যও ছিল। ১৬৪৭ সালে দারুণ শীতের মধ্যে হঠাৎ উজবেকদের আক্রমণে সে বাহিনীও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। (সতীশচন্দ্র, পৃঃ ১৮৩) কোনো রকমে কিছু সৈন্য দিল্লীতে ফিরে এসেছিল। তাহলে কি বিশ্বাস করতে হবে শত্রুপক্ষের হঠাৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত হিন্দু-মুসলমান সিপাহারা একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যের জন্য একে অপরের সাহায্যপ্রার্থী হননি? তারা চরম মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও একে অপরকে জাগতিক দিক থেকে এড়িয়ে গেছে? এরপর আসে "শুদ্ধি" নামক রক্ষা কবচের কথা। সীতারাম লিখছেন যখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত বা "শুদ্ধি" করলেন তখন তাকে সমাজ গ্রহণ করল। আর একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সীতারামই কেবল একমাত্র এই সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ তিনিই জানিয়েছেন যথেষ্ট অর্থ না থাকার জন্য "শুদ্ধি" নিতে তাঁর বিলম্ব হয়েছিল। অর্থাৎ অর্থ থাকলেই "শুদ্ধি"রও সুযোগ আছে। প্রকৃতপক্ষে এই "শুদ্ধি"র ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে কোনো নতুন নয়। ক্যালকাটা রিভিয়ু (Calcutta Review) পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৩৪) এক লেখক মূল উৎস থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সমগ্র মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের আমলেও এই 'শুদ্ধি'র নিয়ম প্রচলিত ছিল সারা ভারতে। সিন্ধু থেকে মথুরা, গুজরাট থেকে কাশ্মীর এবং কাশী থেকে থাট্টা পর্যন্ত। সবাই যে কেবল সমাজের শাসনে ধর্ম হারিয়েছে এটাও সত্য নয়—অনেকে রাজানুকূল্য ও অর্থের জন্যও। ১লা মে, ১৯৮১ "দি ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা থেকে জানা যায় উত্তর-প্রদেশের বুলন্দশহরের ছত্রীর নবাব পরিবারের পূর্বপুরুষরা রাজপুত ছিলেন। বর্তমান নবাবের মতে অর্থের জন্য তাঁরা সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলে ধর্মান্তরন স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। এটা কোনো নতুন নয়—অর্থের কারণে বৌদ্ধ হিন্দু হয়েছে, রোম্যান ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট হয়েছে বা উল্টোটাও ঘটেছে দেশে-বিদেশে সর্বত্র। যাই হোক, যেখানে "শুদ্ধি" নামক রক্ষাকবচ বিদ্যমান, অভিজ্ঞতাও নতুন কোনো উপলব্ধি ঘটায় না সেখানে কেবল এই ছোঁয়া-ছুঁইয়ের জন্যই কি সত্যই সিপাহীরা ইংরাজ

বিরোধী হয়ে ছিল না তার পেছনে আরো কোনো লুক্কায়িত কারণ ছিল? এটা খুবই তাৎপর্যজনক যে আফগান যুদ্ধে খাদ্যের অপ্রতুল ব্যবস্থার জন্য সিপাহীরা প্রতিবাদ করলে ইংরেজ সৈনাধ্যক্ষের আদেশে প্রতিবাদকারী হিন্দু-মুসলমান ছু'জন সুবাদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। (বিপানচন্দ্র, পৃঃ ১৩৮) প্রশ্ন থেকে যায় ইংরাজের পেনশনভোগী সুবাদার হেদায়েত আলীর পক্ষে কি অসন্তোষের আসল কারণটি বলা সম্ভব ছিল?

মহাবিদ্রোহের আরেকটি বিঘোষিত কারণ হিশেবে বলা হয়ে থাকে যে সিপাহীদের বাধ্য করা হয়েছিল সমুদ্র অতিক্রম করে লড়াইতে অংশ নিতে। ফলে তাদের কাছে এটি ধর্মীয় সংস্কারের উপর আঘাত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের সাথে "মডার্ণ ইণ্ডিয়া"র লেখক বিপানচন্দ্র (পৃ ১৩৭) ও একথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি সিপাহীদের তরফে সমুদ্র অতিক্রমে ধর্মীয় আপত্তি ছিল না অন্য কিছু পার্থিব দাবী জানানোর প্রচেষ্টা ছিল? ১৮৫৬ সালে আইন পাশ করে সমুদ্র পেরোনো বাধ্যতামূলক করা হল। বিপানচন্দ্রের মতে এই আইন হিন্দু সিপাহীদের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করেছিল কারণ সমুদ্র পেরোলে জাতিচ্যুতি ঘটবে। ধনপতি সদাগর, বিজয় সিংহের দেশে সমুদ্র পেরোনো সম্পর্কে হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা অবশ্য অন্য কথাই বলে। প্রাচীন যুগে চোল রাজাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের গৌরবময় ইতিহাস বাদ দিলেও বলা যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় বনিকদের জোরদার বানিজ্য ছিল। বানিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইয়েমেনে অবস্থিত—লোহিত সাগরের কূলে মোখা ও জেদ্দা। আরাকানে, পেগু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, মালয় এবং শ্যামের সঙ্গে ভারতীয়দের ব্যবসা সপ্তদশ শতকের গোড়ায় বেশ জমজমাট ছিল। ব্যবসা হোত আবক, গোলমরিচ, কাঁচা তুলো আর নানা বিলাসদ্রব্যকে কেন্দ্র করে। সবচে' কৌতূহলের বিষয় অষ্টাদশ শতকেও জাহাজী ব্যবসায়ে ব্রাহ্মণরা গোমস্তা হিশেবে কাজ করছে। ইতিহাসের এই সত্যের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে ১৮৫৬ সালের আইনের বিরোধিতা সিপাহীরা প্রকৃতপক্ষে কি কারণে করেছিল? ব্যক্তিবিশেষে ছু'একজন সিপাহীর ধর্মনাশের আশংকার কথা ছেড়ে দিলে দলবদ্ধভাবে সিপাহীরা দাবী তুলেছিল সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে সুরেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায় "unfamiliar region" এ যাওয়ার জন্য বিশেষ ভাতা বা বাট্টার দাবী।

প্রথম আফগান যুদ্ধের (১৮৪০-৪২) সময়ে সিন্ধুনদ পেরোনোর শর্তে জেনারেল পোলক বিশেষ বাট্টা দিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার ব্রাহ্মণ সিপাহী থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাজ আর্মি সমুদ্র পেরোতে রাজী ছিল। আর বেঙ্গল আর্মির ছ'টি রেজিমেণ্টও সমুদ্র পেরিয়ে বার্মা যেতে আপত্তি জানায়নি। (সেন, পৃঃ ১৬) তবে ইংরেজদের মুশকিল হল সিপাহীরা ক্রমশঃ বিদেশ যাত্রার জন্য অতিরিক্ত বাট্টা দাবী করছিল। তা'ছাড়া সিপাহীদের সমুদ্র পেরোনোর অতীত অভিজ্ঞতাও মধুর ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতিতে জাভা অভিযানে সিপাহীদের নিয়ে গেলেও অভিযান সমাপ্তির পরও তাদের দীর্ঘকাল স্বদেশে ফিরতে দেয়া হল না। ফলে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল। সুতরাং অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞাত বিপদ সঙ্কুল দেশে বাধ্যতামূলক ভাবে যাওয়ার জন্য ১৮৫৬ সালে কোম্পানী যখন আইন পাশ করল তখন স্বাভাবিক ভাবেই সিপাহীরা তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানালো। সেনের মতে এ ধরণের বিপদের ঝুঁকির বিনিময়ে একজন সিপাহী চায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ। (সেন , পৃঃ ১৮) ১৮৪৫ সালে আমরা দেখি ৩ নং, ৬৯নং, ও ৪নং রেজিমেণ্ট সিন্ধুনদ পেরোনোর জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে বিশেষ বাট্টার। সমুদ্র পেরোনোর ব্যাপারে ধর্মটা যে এক নিছক অজুহাত ছিল সিপাহীদের কাছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি বার্মার যুদ্ধে ১৮২৪ সালে ৪৭নং নেটিভ ইনফেন্টি র সমস্বরে দাবী রেঙ্গুন অথবা সমুদ্র পেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে হলে (" to Rangoon or elsewhere by Sea") তাদের বাট্টার পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে। (মজুমদার , পৃঃ ৪২)।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, দুর্নীতিগ্রস্ত অ-মানবিক শাসন মহা-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। বিপানচন্দ্র ১৮৫৯ সালে লেখা ব্রিটিশ কর্মচারী উইলিয়াম এডোয়ার্সের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী এবং নিম্ন পর্যায়ের আদালতগুলির দুর্নীতিকে এ জন্য দায়ী করেছেন। (বিপানচন্দ্র , পৃঃ ১৩৩) কিন্তু এ ক্ষেত্রে ১৮৫৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী "হাউস অব কমন্স" এ প্রাপ্তি মাননীয় সদস্য জর্জ কর্ণওয়ালের বক্তৃতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত এত দুর্নীতিগ্রস্ত, বিশ্বাস হন্তা এবং ধর্ষণকামী সরকার (১৭৬৫-১৭৮৪র মধ্যে)" এর আগে পৃথিবীতে শাসন করেনি। শোনা যায় স্যার টমাস রামবোল্ড ১৭৭৮ সালে মাদ্রাজে গভর্ণর হয়ে আসার আগে লণ্ডনে বুট পালিশ করে জীবিকার্জন করতেন।

কিন্তু সেই তিনিই দু'বছরের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে স্বদেশে একলক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা পাচার করেছিলেন। (রামকৃষ্ণ; পৃঃ ৩৬৪) মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে উপরওয়ালা ইউরোপীয় সার্জেন্টকে ঘুষ না দিতে পারায় চাকুরী জীবনে দীর্ঘকাল সুবাদার সীতারামকে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে মুঘল আমলে সম্রাটের দরবারে বিচার প্রার্থী হতে পারত। ইংরাজ আমলে দেওয়ানী, ফৌজদারীর বেড়া ডিঙিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে গভর্ণর জেনারেল দূরে থাকুক একজন জেলা কালেকটারের কাছে পৌছানোই অসম্ভব ছিল। ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা মুঘলদের মত খোলা দরবার ছিল না। যেখানে ধনী-দরিদ্র সবাই আর্জি পেশ করতে পারে। একমাত্র অর্থ থাকলে উকিলের মারফত যাওয়া সম্ভব ছিল। সুবাদার সীতারাম ভুল করে খোলা দরবার ভেবে সরাসরি ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে একবার ঢুকে পড়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে দশটাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল। গোটা ব্যাপারটা অনেকদিন পযন্ত তার কাছে পরিষ্কার হয়নি। আগ্রার তৎকালীন সদর আদালতের বিচারক রাইকসের মতে উত্তর-প্রদেশের জনসাধারণ "যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই আমাদের দেওয়ানী ব্যবস্থাকে অপছন্দ করে।" আসলে বিচারালয়গুলি ছিল ভারতে কোম্পানীর নির্যাতনের প্রধান হাতিয়ার। উৎকোচ ছাড়া সুবিচারের কোনো আসা ছিল না। এর উপর আদালতগুলিও ছিল গ্রাম থেকে বহুদূরবর্তী শহরে—পথ-ঘাটের অব্যবস্থার ফলে যাতায়াত করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। আর বিচারও দু'একদিনে নিষ্পত্তি হোত না— সুবিচারের নামে দীর্ঘকাল ধরে জের টানা হোত। ফলে সাধারণ মানুষের অর্থের উপর দারুণ চাপ। পড়ত।

ভারতীয় নাগরিকদের অর্থনৈতিক সামাজিক দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহীদের প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করতে হবে। কারণ সিপাহীরা কেউ দ্বীপে বাস করত না। ছাউনীতে তাদের পরিবাররাই শুধু বাস করত না, গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। সুতরাং কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে তাদের কোনো মোহ থাকার প্রশ্ন ওঠে না। ভারতে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী তিন-ভাগে বিভক্ত ছিল। বেঙ্গল, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। যারা মহা-বিদ্রোহে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল সেই বেঙ্গল আর্মির একলক্ষ সত্তর হাজারের মধ্যে ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যা ছিল একলক্ষ চল্লিশ হাজার। আর এদের বেশির ভাগই অযোধ্যা, বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আসার ফলে

সামাজিক সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তা'ছাড়া সিপাহীদের মধ্যে যারা ছিল— যেমন, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাঠ এবং সৈয়দ ও পাঠান মুসলমানরা, এরা কেউই হা-ঘরে পরিবার থেকেও আসেনি। প্রত্যেকেরই কিছু জমি ছিল। কেউ এসেছিল গ্রাম্য পট্টিদার বা গ্রাম্য জমিদারের পরিবার থেকে। আবার এদের প্রধান খাদ্যবস্তু, পরিধান এবং ভাষার মধ্যেও অভিন্নতা ছিল। সুতরাং "সেলল'জ" বা "ইনাম কমিশনে"র যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ভূমিমালিকানার উপর পড়েছিল তার থেকে পারিবারিক জীব হিশেবে তারাও রেহাই পায়নি। পরিবারের জমি খননের দায়ে কিভাবে কোম্পানীর আশীর্বাদপুষ্ট মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে সে ঘটনা তাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল না কারণ 'মার্কসের ভাষায় সিপাহীরা ছিল "উর্দি গায়ে কৃষক"। ডডওয়েলের মতে অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সিপাহীরা সেখানের জনগণের অসন্তোষের সাথে একাত্মতা অনুভব করত। (পৃঃ ১৭১) প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদর কেউ কেউ গোপনে পত্র মারফত বিদ্রোহে উসকানী দিত। (ররার্টস ; পৃঃ ৬৫)

অন্যদিকে মাহিনার দিক থেকেও সামরিক বৃত্তিকে ভালবাসার বিশেষ কোনো অতিরিক্ত উৎসাহ সিপাহীদের তরফে ছিল না। যেখানে একজন সিপাহী তার কর্মজীবন শুরু করে বাৎসরিক ৮৪ টাকা বা ১০৮ টাকা দিয়ে সেখানে একজন সর্বনিম্ন ইউরোপীয়ান অফিসার এনসাইন আরম্ভ করে বাৎসরিক ১,০৮০ ডলার হিশেবে, তার উপর ভাল পোষ্টিং পাওয়ার জন্য ইংরাজ সার্জেন্টকে দিতে হবে মোটা টাকার ঘুষ। তবু ওই সামান্য টাকাতেও তখনকার বাজারে হয়ত চলা সম্ভব ছিল যদি না ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বিরাট যৌথ পরিবার প্রতিপালন করতে হোত। ফলে কাজ ছিল অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আর চাকরীতে একজন সিপাহীর ভবিষ্যতই বা কী? যতই বীরত্ব দেখাক সামান্য সাব-অলটার্ণ (ক্যাপটেনের চেয়ে কিছু কম) ও হোতে পারবে না। সারাজীবন চাকুরী করেও সদ্য পাশ করা ইংরেজ অফিসারের দাত-খিঁচুনি খেতে হবে! শুনতে হবে গালাগালি "নিগার"! "শূয়োর"!! (সেন, পৃঃ ২৩) সীতারাম পঁয়ষট্টি বছরে সুবাদারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তবে এ সৌভাগ্যও কদাচিৎ দু'একজনের কপালে জুটত। মাদ্রাজের তৎকালীন গবর্ণর স্যার টমাস মুনরো সিপাহীদের কাছ থেকে এক উড়ো চিঠি পান। সেই চিঠিতে ইংরেজদের সম্পর্কে তীব্র মনোভাবের এক ছবি পাওয়া যায়।" আমরা সিপাহীরা তলোয়ার দিয়ে যদি প্রদেশ জয় করি।

কাপুরুষ ফিরিঙ্গিরা সেই দেশ দখল করে সেখানে নবাব সেজে বসে এবং অল্প সময়ে টাকা-পয়সায় বাক্স ভর্তি করে ইউরোপে ফিরে যায়। কিন্তু একজন সিপাহী যদি সারা জীবন খেটেও মরে তবু পাঁচটি কড়িও সে বাড়তি পায় না।" বাড়তি দূরে থাকুক যে সমস্ত ভাতা আগে চালু ছিল তা থেকেও সিপাহীদের নানা কায়দায় বঞ্চিত করা হল। সিন্ধু-পাঞ্জাব যতদিন কোম্পানীর রাজ্য হিশাবে অন্তর্ভূক্ত হয়নি ততদিন ওখানে অভিযানে গেলে বিদেশ ভাতা মিলত-তার কারণ দুর্গম, নদী-সঙ্কুল অঞ্চল। কিন্তু যেই ওই দুটি অঞ্চল কোম্পানীর দখলে এল সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাকৃতিক অসুবিধা বিদ্যমান সত্ত্বেও বিদেশ ভাতার বাড়তি টাকা বন্ধ করে দেয়া হল। ১৮৪৯ ন নর ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের গোবিন্দ গড়ে ৬৬নং রেজিমেণ্ট এর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করলো- স বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করে দেয়া হল।

একই ক্যানটনমেণ্ট বা সেনা ছাউনিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থানের মধ্যে সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে স্বর্গ ও নরকের মত পার্থক্য ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ানের মতে ইংরাজ সাব-অলটার্ণ গ্রীষ্মের দুপুরে বিরাট বাংলো বাড়ীতে আরামের জীবন কাটায়। ব্র্যাণ্ডি আর সোডা-জল নিয়ে ভাবতে থাকে সম্ভাব্য প্রমোশনের কথা। বিভক্ত সীমারেখার অপর দিকে কুকুরের মত গর্তে ("dogholes") অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিরাট পরিবার নিয়ে বাস করত ঋণে জর-জর হতাশাগ্রস্ত সিপাহীরা। চোখের সামনে দিয়ে সামান্য সুবিধাগুলোও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আগে চিঠি পাঠাতে খরচা লাগত না এখন থেকে তা'ও লাগছে। বিদেশ অভিযানে অযোগ্য বিবেচিত হলে পেনশন নিয়ে অবসর নেয়া যেত-এখন সে সুবিধাও বাতিল হল। খালি পেটে সন্ধ্যাবেলা কোম্পানীর সর্বনাশ ছাড়া আর কি চিন্তা আসবে। "যদি রুশ সম্রাট ব্রিগোডিয়ার নেপোলিয়ান এবং রোমের সম্রাটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোম্পানীকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে।" (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ৪-১৫)

একথা সম্পূর্ণ ভুল বেঙ্গল আর্মিতে উচ্চবর্ণের আধিক্য থাকায় বিদ্রোহ ঘটেছিল। কর্ণেল হাণ্টার মনে করেন না বর্ণভেদ বিদ্রোহের কোনো কারণ। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন সাঁওতালদের কোনো জাতি নেই, ভীলরা কোনো জাতিভেদ স্বীকার করে না তবু তারা মহাবিদ্রোহের সময়ে অনেক জায়গাতেই সিপাহীদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। আসলে ইংরাজরা এমন এক

সন্দেহ ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার ফলে সিপাহীদের পক্ষে কোম্পানীর উপর আর কোনো আস্থা রাখা সম্ভব ছিল না। (সেন ; পৃঃ ৩৯)

ট্রেভেলিয়ানের মতে উঁচু মাহিনা ও মর্যাদার জন্য বুদ্ধিমান ও সমজদার লোকেরা রেজিমেণ্ট ছেড়ে সিভিলিয়ান চাকুরীতে চলে যাওয়ায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্মদক্ষ উপযুক্ত ইংরেজ অফিসারদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। (পৃঃ ৩৬) সুরেন্দ্রনাথ সেনও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। পৃঃ ১০) অর্থাৎ ব্যাপারটি এই দাঁড়াচ্ছে যে, এই সব লোকেরা যদি রেজিমেণ্ট ছেড়ে সিভিলিয়ান চাকুরীতে না যেত তাহলে আর অসন্তোষের কারণ ঘটত না। তাহলে দেখা যাক, এই সব লোকেরা কি পরিমাণ দক্ষ ছিল আর অসামরিক বিভাগ এদের সেবায় কতকটা লাভবান হয়েছিল ? হাতের কাছে যা' প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে দেখতে পাই এদের নির্বুদ্ধিতা ও চণ্ডপ্রতাপ জনসাধারণকে যেমন বিদ্বিষ্ট করে তুলে ছিল তেমনি সহকর্মী প্রকৃত সিভিলিয়ানদের কাছে (যারা সিভিলিয়ান হিশেবেই চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন) উপহাসের পাত্র রূপে হাজির করেছিল। সদ্য অধিকৃত পাঞ্জাবে এ ধরণের অনেক অফিসার অসামরিক পদে আসীন হয়েছিলেন। যেমন, মেজর অ্যাডামস, লেঃ প্যাসকে, কর্ণেল রাসক প্রভৃতি। ১৮৫৯ সালে বেঙ্গল সিভিলিয়ান জন বীমস পাঞ্জাবে এ ধরণের অনেক মিলিটারী অফিসারকে সিভিলিয়ানের পদে দেখেছেন। তাঁর মতে সিভিলিয়ানদের কাজ সম্পর্কে কোনো ট্রেনিং না থাকায় এই সব সামরিক অফিসাররা অত্যুৎসাহে যতসব অকাজ করতেন এবং রুক্ষ মেজাজ দেখাতেন। বীমস এই প্রসঙ্গে দু'জন ডেপুটি কমিশনারের নাম করেছেন। কর্ণেল ম্যাকনীল আর লেঃ প্যাসকে। বীমস আরো লিখেছেন যে এই সব সামরিক অফিসারদের ইংরাজ সিভিলিয়ানরা ব্যঙ্গ করে আড়ালে বলত "কাছারি ক্যাপটেন !" তাঁর ভাষায় এঁরা ছিলেন "কর্কশ, মাথা মোটা, দাম্ভিক" এবং সহকর্মীদের প্রতি ভদ্র ব্যবহারে অসমর্থ। (বীমস ; পৃঃ ১২৫) তাহলে প্রশ্ন থাকে যারা ইংরাজ সহকর্মীদের সাথেই ভদ্র ব্যবহারে অসমর্থ তারা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া যায় রেজিমেণ্টে থাকত তাহলে কি প্রকৃতই সিপাহীদের অভিযোগ বা অসন্তোষের কারণ ঘটত না ? কি ঘটতো তার প্রমাণ তো পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল ম্যাকসনের পরিণতিতেই পাওয়া যায়। যার দোর্দণ্ড শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে এক স্থানীয় মুসলমান বিপ্লবী তাঁকে ছুরিকা বিদ্ধ করে হত্যা করলেন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩। লর্ড রবার্টসও

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন লোকে তাকে ভয় করত। (রবার্টস ; পৃ ২৮) এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেন যে বলেছেন দক্ষ সিভিলিয়ানদের সদ্য অধিকৃত পাঞ্জাবে পাঠানো হয়েছিল একথাটিও সত্য নহে। (পৃঃ ২৮ জন বীমসের এদেশে প্রথম পোস্টিংই হয়েছিল পাঞ্জাবে যখন তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বীমসের মতে পাঞ্জাবে তখন নিয়ম-কানুন বলে কিছু না থাকায় রুক্ষ আইন প্রয়োগের পক্ষে সামরিক রেজিমেন্টের অফিসাররাই ছিল উপযুক্ত। (বীমস, পৃঃ ১২৬) সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ সেনের এ বক্তব্যও ঠিক নয় যে দক্ষ সিভিলিয়ান-রা পাঞ্জাবে চলে যাওয়ার ফলে মহাবিদ্রোহের সময়ে অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন "Second best" বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে উৎকৃষ্ট সিভিলিয়ানরা। অর্থাৎ সমস্ত উৎকৃষ্টরা যেন পাঞ্জাবে চলে গেছল যা' তথ্যের দিক থেকেও সত্য নয়।

মনেরাখা দরকার ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এদেশে সিভিলিয়ানরা কোর্ট অব ডাইরেকটারদের দ্বারা মনোনীত হয়ে আসতেন। সুতরাং যোগ্যতার চেয়ে আত্মীয়তা বা প্রভাব বেশি কার্যকরী হোত। জন বীমস ১৮৫৫ সালে অকসফোর্ডে বেলিয়ল স্কলারশিপের পরীক্ষায় ফেল করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডাইরেকটারের বন্ধু ছিলেন বীমসের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ওই ডাইরেক্টারের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রধান শিক্ষক ম'শায় বীমসকে মনোনীত করেন ভাবতে সিভিল সার্ভিসের পদে। প্রধান শিক্ষক ম'শায় অন্যান্য ছাত্রদের বাদ দিয়ে তাকেই কেন মনোনীত করেছিলেন, এর জবাবে বীমসের ধারনা ছাত্র হিশেবে তাঁর ছন্নছাড়া প্রকৃতি—"a youth of erratic tendencies." (পৃঃ ৬০) উত্তরকালে বীমস সুপণ্ডিত ভাষাবিদ বলে খ্যাতি অর্জন করলেও সিভিলিয়ান হিশেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ তাঁর চাকুরীর সাথে মানসিক প্রকৃতির ছিল দুস্তর তফাত। তবু পণ্ডিত বলে সিভিলিয়ান হিশেবে বীমস স্বভাবতঃই ছিলেন কিছুটা মানবিক—নইলে বেশির ভাগই আসতেন সাম্রাজ্য-বাদের গোঁড়া প্রহরী হয়ে। এদেশের লোকের উপর চাবুক চালানোই ছিল তাঁদের নিত্যকর্ম। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংলণ্ডের তখন ছিল রমরমা অবস্থা। আমেরিকা হস্তচ্যুত হলেও ইউরোপে, আফ্রিকায়, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন উপনিবেশ লাভ করেছে। ১৮১৫ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারতে গঙ্গা থেকে দক্ষিণের সুবৃহৎ অঞ্চলের উপর আধিপত্য কায়েম করে ফেলেছে। আর সেই আধিপত্যে যাতে এতটুকু শৈথিল্য না ঘটে তার

জন্য সাম্রাজ্যবাদী মেজাজে পোক্ত করে পাঠানো হোত তরুণ বয়সী ইংরাজ সিভিলিয়ানদের। সিভিলিয়ান হেনরী বার্টন যিনি ষাটের দশকে এসেছিলেন তিনি স্যার জন লরেন্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছেন, "রুক্ষতার বিদ্যালয়ে এঁদের শিক্ষা হয়েছিল এবং খুব কঠোর হস্তে এঁরা তাৎক্ষনিক বিচার প্রদান করতেন।" (কটন, পৃ ৬৪) আর তরুণ অনভিজ্ঞ সিভিলিয়ানরা এঁদেরই আদর্শ মানতেন। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস মনরোর কঠোর স্বভাবের জন্য হেনরী বার্টন বলছেন লোকে তাঁকে "কেউটে" বলে মনে করত। কিন্তু সরকার তাকেই যোগ্য মনে করতেন—তাদের বিবেচনায় তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী ম্যাজিস্ট্রেট বা "Strong Magistrate" কটনের মতে অপরিপক্ক বয়সে একজন সিভিলিয়ানের হাতে এত বেশি ফৌজদারী ক্ষমতা দেয়া ছিল যে তাতে "অন্যায়, অবিচার না করাটাই ছিল আশ্চর্যের ব্যাপার।" তখন "কঠোরতাকেই গণ্য করা হোত শক্তির নিদর্শন।" সুতরাং এ ধরণের সিভিলিয়ানদের শাসনে যে ভারতবাসী পবিত্রাহী ডাক ছাড়বে সে ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে? তাই এদের মধ্যে কোনো "Seconnd best" বা অনুক্ত "First best" খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই নিরর্থক। অবশ্য মিলিটারী অফিসারদের সবাই যে সিভিলিয়ান পদ পছন্দ করতেন তা'ও নয়। ট্রেভেলিয়ান, সুরেন্দ্রনাথ সেন এ কথা স্বীকার করেন। লর্ড রবার্টস ১৮৫৭ সালে পি ডব্লু. ডি'তে স্থায়ী পদে যোগদানের প্রস্তাব পেয়েও সামরিক বিভাগে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন। (রবার্টস, পৃঃ ৫৮) অতএব এটা কোনো ব্যাপার নয় যে দক্ষ সামরিক অফিসাররা অসামরিক বিভাগে চলে গেছল অথবা অ-দক্ষ সিভিলিয়ানরা মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্বে থাকার ফলেই মহাবিদ্রোহের অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতিহাস এত সরল সমীকরণে বিশ্বাসী নয়।

সুবাদার সীতারাম মহাবিদ্রোহের অন্যতম হেতু হিশেবে ইংরাজ সামরিক অফিসারদের (অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে কর্মরত) সিপাহীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন, তাঁর মতে বিগত দিনের অফিসাররা সিপাহীদের ভাষা বুঝতেন, বাঈজীদের সাথে মেলামেশা করার ফলে দেশীয় লোকেদের মর্মবেদনা বুঝতেন আর সিপাহীদের সাথে প্রীতি স্নিগ্ধ আচরণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন, কোলিয়ার এবং প্রতুল গুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সীতারামের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেছেন। (সীতারামের উক্তি এবং প্রায় একই ধরণের

বক্তব্য সুবাদার হেদায়েত আলীর ; সেন, পৃঃ ২৩-২৫) প্রতুলগুপ্ত সীতারামের সমর্থনে জনৈক জেনারেল জেকবের কথা বলেছেন যিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় "নেটিভ"দের সাথে কাটিয়েও তাদের কোনো একটি ভাষায় পাশ করেননি।

সিপাহীদের সাথে ইংরাজ অফিসারদের সম্পর্ক সাধারণভাবে কোন দিনই প্রভু-ভৃত্যের চেয়ে উন্নত ছিল না। এক রেজিমেণ্টে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলে কিছু সিপাহীর সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে-তবে সেক্ষেত্রেও সেবকের আনুগত্যটাই প্রধান কথা। সুবাদাব হেদায়েত আলীর অভিযোগ বর্তমানে অফিসারদের বাংলোতে সিপাহীরা দেখা করতে গেলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু পূর্বেও কি তা' ছিল না? ১৭৮০ সালে "শের মুতাক্ষরীণে"ব লেখক ঘুলাম হুসেন মন্তব্য করছেন, "ইংরাজরা কদাচিৎ আমাদের সাথে সাক্ষাত করে।" তাঁর আরও অভিযোগ ইংবাজ অফিসারদের সাথে দেখা করা শক্ত বলে কোনো সমস্যা জানানো যায় না। প্রধান যে অসুবিধাব কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে ভাষার। (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ৯৪) বিদ্রোহ সে আমলেও ১৭৬৪ সালে বেঙ্গল আর্মিতে ঘটেছিল। সুবাদার সীতাবাম তাঁব সৈনিক জীবনের প্রথম দিকের মধুব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি ১৮১২ সালেব ১০ই অক্টোবর চাকুরীতে যোগ দেন আর সেই বছবই তিনি এক ইংবাজ সার্জেণ্টেব কথা বলছেন—যে বিনা অপরাধে সিপাহীদের মার-ধর করে, মুখের উপর কেশে দেয়। (সেন, পৃঃ ২৩) ১৮১৮ সালে অর্থাৎ সীতারামেব যোগদানের মাত্র ছ'বছরের মধ্যে মেজর জেনারেল স্যার টমাস মুনরো গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসকে এক রিপোর্টে জানাচ্ছেন," আমাদের সবচে বড দোষ যে ভাবে আমরা নেটিভদের অসম্মানের সঙ্গে দেখি। তাদের মনে করি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, মিথ্যেবাদী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত।" মেজব জেনারেলের এই সুস্পষ্ট উক্তির পর সুরেন্দ্রনাথ সেন সুবাদার সীতারামের বক্তব্যেব উপর ভিত্তি করে যখন রায় দেন যে পূর্বতন ইংরাজ অফিসারেরা সিপাহীদের "Best friend" বা সর্বোত্তম সুহৃদ ছিল তখন কাকে বিশ্বাস করব? ইংরাজদের পেনশনভোগী সীতারামের পক্ষে সঙ্গত কারণে সমস্ত সাম্রাজবাদী ইংরাজ অফিসারদের মন্দ বলা সম্ভব ছিল না—তাই চেষ্টাকৃত ভাল-মন্দের বিভাগ!

এটাও ঠিক নয় যে পরবর্তী ইংরাজ অফিসারেরা হিন্দুস্তানী জানতেন না-

বিগত দিনের অফিসারদের মতই কেউ ভাল জানতেন আর কেউ চলনসই। ১৮৫৮ সালে জেনারল জেকব তাঁর দেশীয় ভাষায় অজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন। (গুপ্ত, পৃঃ ৩৯) পণ্ডিত না হতে পারেন এর মানে এই নয় যে তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতীয়দের মধ্যে কাটিয়েও তাদের ভাষা বুঝতে বা একটু-আধটু বলতে পারতেন না। তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে "ভারতের নেটিভদের সাথে মোটামুটি পরিচয়" তাঁর ছিল। সীতারাম কর্নেল চার্লস ষ্টুয়ার্টের কথা উল্লেখ করেছেন। যিনি হিন্দুস্তানী বলতে পারতেন, বাইজী পুষতেন আর প্রয়োজনে বাইজীদের মারফত সিপাহীদের খোঁজ খবর নিতেন। শুধু তিনি নন এরকম আরো অনেকে করতেন। মনে রাখা দরকার পরবর্তী ইংরাজ মিলিটারী অফিসারদের সিবিলিয়ানদের মতই উচ্চ পদে স্থায়ী হতে গেলে হিন্দুস্তানী শুধু জানা নয় তাতে পাশ করা ছিল বাধ্যতামূলক। হিন্দুস্থানী পাশ না করার জন্য ১৮৫৬ সালে গবর্নর-জেনারেল ক্যানিং (লর্ড) রবার্টসকে পেশোয়ারের ডেপুটি অ্যাসিষ্টেণ্ট কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের কাজে সাময়িক ভাবেও নিযুক্ত করতে রাজী হন নি। মুনশী রেখে পাশ করার পরই তিনি ওই পদ লাভ করেন। (রবার্টস, পৃঃ ৪৬) ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান বলেছেন হিন্দুস্তানী ভাষায় পাশ করা ছিল অপরিহার্য— "indispensable qualification for the staff." (পৃঃ ৬১) মহাবিদ্রোহের সময়ে আমরা দেখি কিভাবে ক্যাপটেন ক্রেগ স্বচ্ছন্দ হিন্দুস্তানীতে মিরাটের ২০ নং নেটিভ ইনফেণ্ট্রিকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। (সেন, পৃঃ ৬৩) সীতারাম কথিত রক্ষিতা নিয়ে সিপাহীদের সাথে এক সঙ্গে ফূর্তি না করেও ১৮৫০ সালে জেনারেল জেকব (অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের মাত্র আট বছর পূর্বে) আক্ষেপ করছেন যে বেঙ্গল আর্মির সাহেব অফিসারেরা "নেটিভ"দের চাল-চলন অভ্যাস করে তাদের ইউরোপীয় চরিত্র হারাতে বসেছে। (গুপ্ত, পৃঃ ৩৮) এটা কখনোই সম্ভব নয় যদি না সিপাহীদের সাথে মেলামেশা থাকে। সীতারামের এ অভিযোগও সত্য নয় যে এখন সাহেবরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খালি ঘরে বসে থাকে। (চকোলিয়ার, পৃঃ ১০৯) তাই যদি হোত তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর সাহেব চরিত্রগুলো পর-স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াতো না আর পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কেও রিপোর্ট লিখতে হোত না। তবে রক্ষিতা ছাড়াও ইচ্ছে থাকলে অফিসাররা অন্য উপায়েও সিপাহী তথা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা জানতে পারতো। মিলিটারী ক্যাম্পে

ভৃত্য, ঝাড়ুদার, ভিস্তিওয়ালাদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। - মূল বাহিনীর প্রায় তিন গুন। দশ হাজারের বাহিনী হলে এদের সংখ্যা হত তিরিশ হাজার (কোলিয়ার, পৃঃ ৬২)। তা'ছাড়া প্রতিটি ইংরাজ পরিবারে ঘরোয়া কাজ-কর্মের জন্য দেশীয় আয়া থাকত। ১৮৫২ সালে পেশোয়ার যাওয়ার পথে রবার্টস লক্ষ্য করেছেন আয়া-সহ ইংরাজ স্ত্রীরা সিমলায় ছুটি কাটিয়ে লাহোরে তাঁদের মিলিটারী স্বামীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ফিরছেন। (রবার্টস, পৃঃ ১৫-১৭) এত সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি ইংরাজরা সিপাহীতথা সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল না হয়ে থাকে-তাহলে তার কারণ তাদের নিদারুণ অ-মানবিক তাচ্ছিল্য আর নিজেদের শক্তির উপর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। যে তাচ্ছিল্য আব দম্ভ তাদের বুঝতে দেয়নি ১৭৬৪ সালে, ১৮০৬ সালে বিভিন্ন সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বাভাষ, তেমনি ১৮৫৭ সালেও বুঝতে দেয়নি মহাবিদ্রোহের আসন্ন ঝটিকার। নইলে জেনারেল জেকব মহা-বিদ্রোহের মাত্র তিন বছর পূর্বে সদম্ভে বলতে পারতেন না—যা' তাঁর মূর্খ আত্ম-বিশ্বাস, "আমি মনে করি যতক্ষণ ইংরজে অফিসাববা বেঁচে আছে আর তাদেব কাজ করছে ততক্ষণ সিপাহীদের বিদ্রোহেব কোন সম্ভাবনা আছে।" তবে সবাই যে একেবাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না-এ ও সত্য নয়। ১৮৫৭ সালেব মার্চে মাদ্রাজ আর্মিব কম্যাণ্ডার-ইন চীফ দেশীয় বাহিনীর সংগত অভিযোগের কথা তুলে সরকারকে সতর্ক কবে দিচ্ছেন। (গুপ্ত, পৃঃ ৩৮) কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মে মাসের শুরুতেই বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছিল।

কেই, ট্রেভেলিয়ান, কোলিয়ার, মজুমদাব প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ধারনা সামবিক বিভাগে শাস্তির শিথিলতার জন্য শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন কোনো বিদেশী শক্তির পক্ষে কেবল কঠোর শাস্তির দ্বারা কখনোই শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়। বেঙ্গল আর্মিব ইংরেজ অফিসাররা তাদের অভদ্র আচরনের দ্বারা সিপাহীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিল। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যে বেত্রাঘাত তুলে দেয়াকে শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার একটি কারণ বলে ঠাওরেছেন সে বক্তব্যকে সরা-সরি সুরেন্দ্রনাথ সেন অসত্য বলেননি। (ট্রেভেলিয়ান পৃঃ ১৭ এবং সেনের মতামত ; সেন, পৃঃ ২৭) বস্তুতঃ গোটা কোম্পানীর রাজত্বে মাত্র বার বছরের মত বেত্রাঘাত নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪৫ সালে এটি আবার চালু

হয়েছিল। লর্ড রবার্টস স্বয়ং বেত্রাঘাতের দৃশ্য পেশোয়ারে ১৮৫৩ সালে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছিলেন। (রবার্টস, পৃঃ ৪৩২, পাদটিকা) ইংরেজদের তরফে কঠোর শাস্তির দ্বারা শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে কোনোদিন শৈথিল্য ঘটেনি। ১৭৬৪ সালে বাংলায় প্রথম যে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল তার তিরিশজন বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে শৃঙ্খলারক্ষার পক্ষে কঠোর উদাহরণ রাখার চেষ্টা হল। তবু সিপাহীদের বিদ্রোহ থামেনি। ১৮০৬, ১৮২৪, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৯ সালের বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। বিদ্রোহের কারণ শাস্তির শিথিলতা নয়—সুরেন্দ্রনাথ সেন সঠিক মন্তব্যই করেছেন :— "যখন কোনো বিদেশী শক্তি একটি দেশের উপর আধিপত্য করে······তখন কিছু আগে বা পরে অভ্যুত্থান এবং বিদ্রোহ দেখা দিতে বাধ্য।" (সেন, পৃঃ ২৭) সিপাহীরাও সমস্ত ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াবে। তাই দেখি একজন পেনশনভোগী সিপাহী ইংরাজ উপরওয়ালাকে খবর দিচ্ছেন, "ও সাহেব, সৈন্যরা আর ভয় পায় না।" (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ১৭)

১৮৪৮ সালে গবর্ণর জেনারেল হলেন লর্ড ডালহৌসী। মাত্র আট বছরে সাম্রাজ্যগ্রাসের এক নগ্ন উদাহরণ রেখে গেলেন। উদ্দেশ্যে পৌছোবার ভিত্তি ছিল তিনটি। প্রথমটি সরাসরি শক্তি প্রয়োগে দখল; দ্বিতীয়টি কুশাসনের অজুহাত আর তৃতীয়টি স্বত্ববিলোপনীতি অর্থাৎ দত্তকপুত্রের দাবী অস্বীকার। প্রথমের দ্বারা পাঞ্জাব ও নিম্ন ব্রহ্ম দখল করে উত্তর-পশ্চিমে এবং পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের সীমানা বিস্তৃত হল। আর দ্বিতীয় নীতি প্রয়োগ করে অযোধ্যা রাজ্য গ্রাস করলেন। অযোধ্যার নবাব শাহ ওয়াজেদ আলীর বিরুদ্ধে কুশাসনের তৈরী রিপোর্ট পাঠালেন ইংরেজ রেসিডেণ্ট। আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে—সকল শ্রেণীর প্রজার ইচ্ছা নবাবকে গদীচ্যুত করে সরাসরি ইংরেজ শাসন বলবৎ হোক। কথাটি যে সর্বৈব মিথ্যা তার প্রমাণ অযোধ্যার অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের বিদ্রোহে যোগদান। হেনরী লরেন্সের জীবনীকার হারমান মারিবেল লিখেছেন, "···ওখানে অত্যাচার এত দূর হয়নি যার জন্য ওটি (অযোধ্যা) কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হতে পারে।" রেসিডেণ্টের রিপোর্টে প্রজাদের উপর উৎপীড়নের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার উত্তরে শুধু এটুকু বলা যায় যে দলে দলে কৃষকরা গ্রাম পরিত্যাগ করে সুশাসনের লোভে প্রতিবেশী ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় নেয়নি। এদিকে নবাবের অসম্মান—তাঁকে পেনশন দিয়ে কলকাতায় নির্বাসন দেয়া হয়েছিল—সাধারণ

মুসলমানদের ভাব প্রবণতায় দারুণভাবে আঘাত হেনেছিল। আবার অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু তালুকদার যারা পুরুষানুক্রমে নবাবের প্রদত্ত জায়গীর ও তালুক নিশ্চিন্তে ভোগ করছিল এবং খাজনা আদায় ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ছিল প্রায় সর্বেসর্বা তারা এবার সেই পুরোনো ক্ষমতা ইংরেজ শাসনে হারাতে বসলো। নবাবের ষাট হাজার সৈন্যের মাত্র কিছু ইংরেজ বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হল—বাকীরা সব ছাঁটাই। ওদিকে দরবারকে কেন্দ্র করে এতদিন যে সব কারিগর ও শিল্পী নিযুক্ত ছিল তারাও তাদের জীবিকার্জনের সুযোগ হারালো। তরুন ইংরেজ কালেকটাররা খাজনা আদায়ে রেকর্ড সৃষ্টি করতে উঠে পড়ে লাগলো। রীড বলছেন, "প্রজাদের দিয়ে নিজেদের ধনাগার ভর্তি করতে গিয়ে ভুলে গেছলাম তাদের সুখী রাখা প্রয়োজন।" (সেন, পৃঃ ১৭৮) তার উপর অযোধ্যার ভূমি ব্যবস্থায় ইংরেজরা কৃষক-মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কারুরই উপকার করল না। একদিকে ভূস্বামীরা তাদের এত বছরের অধিকার হারাল আর অন্যদিকে কৃষকদের কাছে থেকে লঘু হারের বদলে উচুঁ হারে খাজনা দাবী করায় তারাও বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ল।

ডালহৌসী তাঁর তৃতীয় নীতি অর্থাৎ দত্তক পুত্রের স্বত্ব লোপ নীতি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে সাতারা, ঝান্সী, নাগপুর, জৈতপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। পেশোয়া বাজীরাওয়ের মৃত্যু হলে তাঁর দত্তক পুত্র ধুন্দপন্থ বা নানাসাহেবকে তিনি বাজীরাওয়ের বৃত্তি দিতে অস্বীকার করলেন। দত্তক পুত্র ভারতের সনাতনী প্রথা। এই প্রথা এর আগে কেউ অগ্রাহ্য করেন নি। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মহা-বিদ্রোহে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং বঞ্চিত নানাসাহেব এই কারণেই বিশেষ জোরদার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহোসী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন কোম্পানীর বাৎসরিক আয় আরও চারকোটী বাড়াবার সন্তোষ নিয়ে। কিন্তু লক্ষ্য করলেন না ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ। যে অসন্তোষ বিলেতে বসেও পরবর্তী গর্ভনর জেনারেল ক্যানিং এর দৃষ্টি এড়ায় নি। "...যে কোনো সময়ে একটা ছোট্ট মেঘ দেখা দিতে পারে, মানুষের হাতের চেয়ে বড় নয়। তারপর বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ে আমাদের সর্বনাশের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে।" (লণ্ডনে সম্বর্দ্ধনা সভায় ক্যানিং এর ভাষণ)

তবু ক্যানিংও সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর জেনারেল। তাই ভারতে এসে

প্রথমেই তাঁর চেষ্টা হল বাহাদুর শাহ'র মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতীক-টিকে নির্মূল করে তত্ত্বগত দিক থেকেও কোম্পানীর শাসনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ঘোষণা করলেন বাহাদুর শাহ'র পর তাঁর বংশধরেরা আর "সম্রাট" উপাধি ভোগ করতে পারবেন না। ক্যানিং ভুলে গেছলেন মুঘল সম্রাটের নামের পেছনে একটা ঐতিহ্য ও ভাবপ্রবনতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যে কোনো জমায়েতেব মধ্যমণি হতে পারেন—আর মহাবিদ্রোহে তাই ঘটলো। তাঁর অসম্মান হিন্দু-মুসলমান সমেত সমস্ত ভারতীয়দের চোখে এক ঐতিহ্যের অসম্মান।

১৮৫৭ র শুরুতেই বোঝা যাচ্ছিল সারা দেশটা এক বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। গোটা উত্তর ভারত জুড়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানা গুজব এখান থেকে ওখানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। এবার ইংরেজ শাসনেব অবসান ঘটবে কেন না পলাশীর একশো বছর পূর্ণ হয়ে গেছে।

স্বদেশে আফগান যুদ্ধে (১৮৩৯) আর বিদেশে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৬) প্রমানিত হয়েছে ইংরেজদের সামরিক দুর্বলতা। ভাগ্যদেবীও তাদের প্রতি বিরূপ - নইলে লর্ড ক্যানিং কেন লাট ভবনে কার্পেট পাতা সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন ! এর উপর ১৮৫৬ সালে সিপাহীদের ছাউনী গুলোয় এবং গ্রামে গ্রামে আবির্ভাব হল রহস্য জনক বিদ্রোহের দু'টি প্রতীক চাপাটি (রুটি) আর পদ্মফুল।

আর কোম্পানী ও এই সময়ে আমদানী করল এতদিনে বহু ব্যবহৃত "ব্রাউনবেস" রাইফেলের বদলে "এনফিল্ড" রাইফেল। যা' দূরপাল্লায় কার্যকরী। ১৮৫৬ সালে এই রাইফেলে ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ডের উলউইচ কারখানা থেকে তৈরী হয়ে এল চর্বি মেশানো টোটা। ১৮৫৭ র গোড়ায় মিরাট ও দমদমে এই টোটা তৈরী হতে লাগল। ইতিমধ্যে শোনা গেল এই টোটার প্রয়োজনীয় চর্বি এসেছে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ খাদ্য যথাক্রমে গোরু ও শূকর থেকে। টোটা ব্যবহার করতে গেলে দাঁত দিয়ে চর্বি মেশানো কাগজ ছিঁড়তে হবে আগে। সিপাহীদের পুরো সন্দেহ হল জাতি নাশের এটি ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্র। ভারত সরকারের নথি-পত্র ঘেঁটে ফরেষ্টের ধারণা হয়েছে চর্বির উপাদান সংক্রান্ত অভিযোগ খুবই সত্য এবং লর্ড রবার্টসেরও তাই। (রবার্টস, পৃঃ) অবশ্য পরে নতুন করে টোটা তৈরী হল—বলা হল আর দাঁত দিয়ে কাটতে হবে না। কিন্তু ইংরাজদের সততার উপর

ততদিনে সিপাহীরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তারা রাজী হল না। তাদের দৃঢ় ধারণা হল ক্যানিং সম্পর্কে যে গুজব রটেছে তাই বুঝি সত্য। তিনি নাকি মহারানী ভিকটোরিয়ার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এদেশের সবাইকে অচিরাৎ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবেন!

২৮শে জানুয়ারী, ১৮৫৭, জেনারেল হিয়ার্স এক গোপন রিপোর্টে ব্যারাকপুরে সিপাহীদের ক্রমবর্দ্ধমান ইংরেজ বিদ্বেষের কথা জানালেন। সবার মুখে চর্বি-টোটার চাপা আলোচনা। ক্যানিং-এর কাছে প্রায়ই খবর আসতে আরম্ভ করেছে কে বা কারা সরকারী দপ্তর, বাংলোগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। পুড়ে সব ছাই। গবর্ণর জেনারেল হত-বিমূঢ়!

(২)

অবশেষে অনিবার্যভাবে যা ঘটার তাই ঘটলো। ১০ই মে, ১৮৫৭, দিল্লী থেকে ৩৬ মাইল দূরে উত্তর ভারতের মিরাট শহরে মহাবিদ্রোহ তার বিশাল আকারে ফেটে পড়ল। তবে তারও আগে স্ফুলিঙ্গ দেখা গেছল। বহরমপুরে ১৯নং নেটিভ ইনফেন্টি ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ করল। তার ছোঁয়াচ লাগল ব্যারাকপুরে ৩৪নং এর গায়ে। সশস্ত্র বিদ্রোহের অপরাধে ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসী দেয়া হল। কিন্তু থার্ড ক্যাভেলরির নেতৃত্বে মিরাটে যখন এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করল তখনই প্রকৃত পক্ষে ইংরাজদের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হল। বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জনসাধারন। বাজারে দেখা দিয়েছে গমের ঘাটতি। বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা প্রথমেই জেলখানা ভেঙে দিয়ে মুক্তকরে দিল নিরপরাধ বন্দীদের। হত্যা করল বাধাদানকারী ইংরেজ অফিসারদের। তারপর পরদিন বিজয় গৌরবে ১১ই মার্চ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হল। বিদ্রোহীদের দেখার সাথে সাথে স্থানীয় পদাতিক বাহিনীও তাদের সাথে যোগ দিল। দিল্লীর পতন ঘটল। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা সম্রাট বলে ঘোষণা করল। প্রকৃতপক্ষে দিল্লী এখন মহাবিদ্রোহের কেন্দ্র হল আর সম্রাট হলেন তার জলন্ত প্রতীক। মুসলমান উলেমারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ধর্মযুদ্ধ বলে ফতোয়া জারী করলেন। লড়াই অব্যাহত রাখার জন্য দিল্লীতে একটি সরকারও গঠিত হল। এই লড়াই তীব্রভাবে চলে ছিল ১৮৫৮ সাকের মার্চ পর্যন্ত যখন স্যার কলিন ক্যাম্বেল মার্চ মাসে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধার করেন। তবে

বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে ১৮৫৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যখন তাঁতীয়া টোপী ইংরেজদের হাতে ধৃত হয়ে ফাঁসীতে মৃত্যু বরণ করলেন। বিদ্রোহের প্রথমের দিকে বেঙ্গল আর্মির প্রায় সমস্ত সিপাহীরাই বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিল। এমনকি দেশীয় রাজ্যের সিপাহীরাও। ফলে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, দোয়াব বুন্দেলখণ্ড, মধ্যভারত, বিহারের এক বিরাট ভূখণ্ড এবং পূর্বপাঞ্জাব—প্রায় সবটাই স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহের প্রধান ঝটিকা কেন্দ্র ছিল দিল্লী ছাড়া লক্ষ্ণৌ (৩১শে মে), বেরিলী (৩১শে মে), কানপুর (৪ঠা জুন), ঝাঁন্সী এবং বিহারের আরা জেলা। মহাবিদ্রোহে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন অযোধ্যার বেগম হজরত মহল, ঝাঁন্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, কানপুরের নানা সাহেব, বেরিলীর খাঁন বাহাদুর খাঁ, ফৈজাবাদের মৌলভী আহমেদউল্লা এবং বিহারের কুঁওর সিং। দিল্লীতে সম্রাটের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন বেরিলীর ইংরেজ বাহিনীর প্রাক্তন সুবাদার বখত খাঁ। মহাবিদ্রোহে অযোধ্যার প্রায় সমস্ত তালুকদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—বিশেষ করে ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে যখন গবর্ণর জেনারেল এক-আধ জনের অপরাধে সমস্ত তালুকদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকী দিলেন। অথচ এর পূর্বে মান সিং এবং আর তিনজন তালুকদার ছাড়া কেউ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি (মজুমদার, পৃঃ ৫৪৮)। যাই হোক ওই বছরের ১লা নবেম্বরে মহারানী ভিকটোরিয়ার ঘোষনাপত্রের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হল। সামন্তশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার আশ্বাস দেয়া হল। ফলে অযোধ্যার তালুকদাররাও বেশির ভাগ মহাবিদ্রোহ থেকে সরে দাঁড়িয়ে মহারানীর মার্জনা ভিক্ষা করল। দেখা গেল বিদ্রোহের গতি মন্দীভূত হয়ে পড়েছে। যাইহোক, ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি মহাবিদ্রোহের উপর পূর্ণ যবনিকা পড়ল। মরীয়া, পরিশ্রান্ত ইংরেজদের কাছে মনে হল আবার নতুন করে তারা ভারতবর্ষ জয় করেছে···"India had been reconquered." (সেন, পৃঃ ৪১৭)

(৩)

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোনো লড়াই সে যত সামান্য হোক বা বৃহত হোক তা' চিরকাল দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার লড়াই রূপেই চিহ্নিত হবে—অন্য কোনো ভাবে নয়। কোনো রকম সংখ্যাতত্ত্বের মারপ্যাচ,

আয়তনের কম বেশি, বিদ্রোহীদের অভ্যন্তরীন ঈর্ষার বিবরণ সে সত্যকে উড়িয়ে দিতে পারবে না। ১৮৪৮ সালে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইতালীবাসীর ব্যর্থ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত না হলেও যেমন ছিল এক স্বাধীনতার যুদ্ধ তেমনি ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহও এক স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ সম্পর্কে যে কোনো সন্দিগ্ধতার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাবিদ্রোহের প্রকৃত স্বাধীনতার চরিত্রটিকে সুন্দর ভাবে ব্যাখা করেছেন। তাঁর কথায়:—"১৮৫৭র জনপ্রিয়তা বিচার করতে গিয়ে এটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, যে কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সংখ্যালঘিষ্ট অংশই কেবলমাত্র অংশ গ্রহণ করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নিষ্ক্রিয় থাকে আর স্বার্থ সন্ধানীরা শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের সাথে যোগ দেয়। কোথাও কোনো অভ্যুত্থান সার্বিক সমর্থন লাভ করে না।" যেমন, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বা ফরাসী বিপ্লবের দিনগুলোতে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। সেনের মতে "যে লড়াই শুরু হয়েছিল ধর্মের জন্য তার সমাপ্তি ঘটল স্বাধীনতার লড়াইতে। কেননা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা বিদেশী সরকারকে উৎখাত করে পুরোনো শাসনকেই কায়েম করতে চেয়েছিল—যার বৈধ প্রতিনিধি ছিলেন দিল্লীর সম্রাট।" (সেন, পৃঃ ৪১১), স্তালিন "লেনিনবাদের ভিত্তি" গ্রন্থে স্বাধীনতার লড়াইয়ের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে সেই লড়াই বিপ্লবী লড়াই, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ যার দ্বারা বোঝা যায়" সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হচ্ছে, ভেঙে পড়ছে, তার ভিত নড়ে উঠেছে।" এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লা ও তাঁর সঙ্গীদের লড়াইকে রাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধ—প্রকৃত বিপ্লবী লড়াই বলে আখ্যা দিয়েছেন। (স্তালিন, পৃঃ ৫৭) ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় অঞ্চলের আয়তনের হিসাব দিয়ে আমরা বুঝতে পারব না ভারতের মহাবিদ্রোহ কী ভীষণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধাক্কা দিয়েছিল, যদিও সেটাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—তবু এর গভীরতা আরো ভালভাবে বোঝা যায় যখন দেখি ব্রিটিশ নির্ভর আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা দারুণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। কোলিয়ার লিখছেন, ভিকটোরিয়ার আমলের ইংলণ্ডের বারোমিটার স্টক এক্সচেঞ্জ দারুণভাবে কেঁপে উঠেছিল। বিদ্রোহের এক মাসের মধ্যে চালু ব্যাঙ্ক নোটের পরিমান প্রায় ১,০০০,০০০ পাউণ্ড কমে গেছল।

মহারানী ভিকটোরিয়া উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলছেন, "সময়···অত্যন্ত জটিল।" বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীরাও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। তাদের প্রধান পুরোহিত পোপ নবম পায়াস সাহায্যের জন্য এক বিশেষ তহবিল খুললেন। দামাস্কাসের হোয়াইট নামে এক ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী দু'মিলিয়ন পাউণ্ড দান করলেন ব্রিটেন, গ্রীক, ইতালীর সম্মিলিত বাহিনী প্রেরণের জন্য। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপেলিয়ান ইংরেজবাহিনীকে ভারত অভিমুখে যাওয়ার জন্য স্থলপথে একটি বিকল্প রাস্তার সুযোগ করে দিলেন—ফ্রান্সের উপর দিয়ে মার্সাই যাওয়ার সুযোগ দিয়ে। অন্যদিকে আমেরিকায় ব্রিটেনের ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বাজারে জালি নোটের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। (কেম্ব্রিজ মডার্ণ, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪২) ভারতের মত সম্ভাব্য কাঁচামালের বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনায় যে বিদ্রোহ ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল—বিশেষ করে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়ার পর ভারতবর্ষই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যেখানে সবচে বড খুঁটি—সেখানে রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃঢ় বিশ্বাস এটি এক সিপাহীদের বিদ্রোহ মাত্র! তাঁর মতে একে যদি স্বাধীনতাব যুদ্ধ বলতে হয় তাহলে হেষ্টিংসের আমলে পিণ্ডারীদের লড়াইকেও তাই বলতে হয়-যদিও তিনি তা' বিশ্বাস করেন না। (সিপয় মিউটিনি, পৃঃ ৪১৬) আশ্চর্যের ব্যাপার মারাঠাদের আনুকূল্যে গড়ে ওঠা মধ্যভারতের এই লুঠেরা বাহিনীকে (যা' মজুমদারের ভাষায় "a hoide of cruel marauders," অ্যাডভান্স. হিষ্ট্রি, পৃঃ ৭২৩) ডঃ মজুমদার স্বাধীনতার লড়াইতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সিপাহীদের সাথে সমার্থক করে দেখেছেন! তাঁর চোখে পড়েনি ১৮৫৭ সালে শুধু সিপাহীরা পিণ্ডারী-দের মত একা লড়েনি—গ্রামে গ্রামে গণ জাগরণ ঘটে ছিল। সেই বিপুল গণজাগরণের বর্ণনা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ও দিতে হয়েছে "দি রিভোল্ট অব দি পিপল" শিরোনামে এক দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বর্ণনা তাঁর বিখ্যাত বই "সিপয় মিউটিনি" গ্রন্থে। শশীভূষণ চৌধুরীতো "সিবিল রিবেলিয়ান ইন দ্য ইণ্ডিয়ান মিউটিনিজ" নামে এক প্রামানিক গ্রন্থই লিখে ফেলেছেন। মনে রাখা দরকার এই গণজাগরণ ঘটে ছিল সিপাহীদের সমর্থনেই—পিণ্ডারীদের ক্ষেত্রে যা চিন্তাও করা যায় না।

সেই বিদ্রোহই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ফেটে পড়ে যে বিদ্রোহ জন্ম নেয় সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষের অসন্তোষের মধ্যে আর যাতে

প্রতিটি স্তরের মানুষই কিছু না কিছু সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৮৫৭র মহা-বিদ্রোহের প্রাক্কালে যদি এই সত্যটি পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয় তবেই বোঝা যাবে এটি সামান্য বিদ্রোহ ছিল না ব্যাপক গণজাগরণে স্বাধীনতার লডাইতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কোন সিপাহী বা নেতা দু'একটি ঘোষণাপত্র ছাড়া এই অসন্তোষের কোনো বিস্তৃত বিবরণ রেখে যাননি। আর যে সমস্ত ভারতীয়রা রেখে গেছেন তারা কোনো না কোনভাবে ইংরেজ সরকারের মুখাপেক্ষা ছিলেন। যেমন সুবাদার সীতারাম ও হেদায়েত আলী, বেরিলীর সরকারি কেরানী দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় ও ইংরেজের চাকুরে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। অথবা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত দুই মহাজন। কানপুরের নানকচাঁদ এবং দিল্লীর জীবনলাল মুনশী। এঁদের কাছ থেকে যে প্রকৃত ইংরেজ বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে? এঁদের ইংরেজ বিরোধী বক্তব্য কেবলমাত্র কতগুলি তথাকথিত সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ—যেন এগুলি করার জন্যই এত বড় বিদ্রোহ ঘটল। বরং তদানীন্তন কিছু ইংরাজ অফিসারের বিবরণী ও প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মন্তব্য অসন্তোষের প্রকৃত কারণ এবং তার গভীরতা সম্পর্কে জানতে আমাদের বহুল পরিমানে সাহায্য করে। ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস সামান্য সাব-অলটার্ণ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন ১৮৫২ সালে। মহাবিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন—সব মিলিয়ে প্রায় একচল্লিশ বছর এদেশে কাটিয়ে গেছলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখা করেছেন। রবার্টসের মতে নতুন এক প্রজন্মের উদ্ভব ঘটেছিল যারা "বাস্তব অথবা কল্পিত দুঃখের জন্য বিদেশী শাসকদের দায়ী করতে লাগল।" আবার "কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের শাসনের ধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট থাকত।" রবার্টসের ধারনায় এই অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সরকারের তরফে এদেশকে সুসভ্য করার আকাঙ্খায় "উদারবাদী আইন সমূহ" প্রণয়নে। রবার্টসের পক্ষে এই ধারনাই স্বাভাবিক—কারণ তিনিও একজন সাম্রাজ্যবাদী সেনানায়ক! যাইহোক তাঁর বক্তব্য:—"ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের এই সব কার্যবিধির পূর্ণ সুযোগ নিল। তাদের পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশীয় সৈন্যকে বিরাগভজন করে তোলা এবং সেই সাথে জনসাধারণের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মিথ্যে প্রচার করে:

একটা সাধারণ অসন্তোষ ও সন্দেহ সৃষ্টি করা।"

রবার্টসের মতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই যা আঘাত করেছিল তা' হচ্ছে জমির বন্দোবস্ত। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জমির মালিকানার কাগজ-পত্র খতিয়ে বিচায় করে সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সরকারকে প্রকৃত মালিক কতটা রাজস্ব দেবে তা' নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এতে উভয় সম্প্রদায়ের ধারনা হয়েছিল তাদের প্রতি "নাকি অবিচার করা হয়েছে।" তা' ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য দখলের সাথে সাথে প্রয়োজন দেখা দিল প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার সংশোধনের ও অনুসন্ধানের। "যদিও এই অনুসন্ধান সৎউদ্দেশ্যেকরা হয়েছিল—তবুও তা' উচ্চশ্রেণীর কাছে ছিল নিন্দনীয় এবং অন্যদিকে জনসাধারণকেও সন্তুষ্ট করতে পারল না। ভূমি রাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে সমানাধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টাকে শাসক পরিবারগুলি আক্রোশের সাথে গ্রহন করল।···অন্যদিকে আমাদের আমলে যদিও কৃষিভিত্তিক জনসাধারণের সাধারণভাবে বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছে তথাপি তারা সরকারের মহান উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাদের অবস্থা ও ভবিষ্যতের উন্নতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই অনেক সময়ে জমির প্রকৃত মূল্য নিরূপনে ভুল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চড়া হার ধার্য হয়েছে, কোথাও খুব কড়াভাবে খাজনা আদায় করা হয়েছে আর কোথাও শস্যহানি ঘটলেও যথেষ্ট সুবিধা দেয়া হয়নি। তার উপর বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমির মালিকানার অধিকাব বিক্রি করে আইনকে রাজস্ব আদায়কারীরা তাডাহুড়ো করে প্রয়োগ করেছে।"

রবার্টসের মতে আবেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসন্তোষের কারণ ব্রাহ্মণদের অভিযোগ "আমরা ধর্মকে নস্যাৎ করতে চাই এবং হিন্দুদের কাম্য রীতি-নীতিগুলিকে অমান্য করছি···তা' হচ্ছে লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক স্বত্ববিলোপ নীতির কঠোর প্রয়োগ। এর ফলে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য দখল এবং ভারত সরকার কর্তৃক কিছু রাজনৈতিক ভাতা বাতিল। একে ভারতের জনসাধারণ আগ্রাসী নীতি বলে নিন্দা করেছিল এবং মনে করেছিল দেশের রীতিনীতিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ —যা' নিঃসন্দেহে আমাদের বহু শত্রু সৃষ্টি করেছিল।" কোম্পানীর অযোধ্যা দখলকে সমর্থন করেও রবার্টস জানাচ্ছেন যে "এই ঘটনা দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গের মধ্যে সন্দেহ আর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল···নেটিভরা এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে বুঝে উঠতে পারেনি।"

রবার্টস লিখেছেন ভারতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ মারাঠা, রাজপুত, শিখ অথবা মুসলমানদের এতদিনের পারস্পরিক ক্ষমতা দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ও ধর্মীয় পার্থক্যকে লোপ করতে সাহায্য করল। তাঁর কথায় :— "আমরা এখন সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তিগুলির চোখে সন্দেহ আর আতঙ্কের পাত্র হয়ে দাঁড়ালুম। যারা আমাদের আধিপত্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা বিস্তৃতি রোধের জন্য নিজেদের বিভেদ ভুলে যেতে বদ্ধপরিকর হল।" দেশীয় সৈন্য-বাহিনীর বিদ্রোহকে রবার্টস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখেন নি। তাঁর মতে "সারা দেশে যখন বিদ্রোহের মনোভাবকে চাঙ্গা করে তোলা হচ্ছিল (এ ব্যাপারে তিনি মুখ্যতঃ নানাসাহেবকে দায়ী করেছেন) তখন কি করে আশা করা যায় যে দেশীয় সৈন্যবাহিনী যাদের সাহায্য ছাড়া এই বিদ্রোহ প্রচণ্ড রূপ নিতে পারেনা তারা বিগত তিরিশ অথবা চল্লিশ বছর ধরে দেশে যা' ঘটেছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে ? সিপাহীদের একটা বিরাট অংশ এসেছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায় থেকে-প্রধানতঃ অযোধ্যা প্রদেশ থেকে—সে কারণে তাদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিল জমির অধিকার, ভূমি ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে। এ ছাড়া ধর্ম এবং বর্ণভেদও দেশের অন্যান্য জনসাধারণের সাথে তাদেরও প্রভাবিত করেছিলেন।" (রবার্টস, পৃঃ ৪১৪-৩৭)

রবার্টসের উপরোক্ত বিবরণী থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা থেকে অসন্তোষের কারণগুলি ব্যাখ্যা করলেও কতগুলি মূল সত্য আমাদের সামনে হাজিব করেছেন। বলা ভাল হাজির করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই সত্যগুলি হল :—এক, ইংরেজ বিরোধী এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব, দ্বিতীয়, ভূমিরাজস্ব বিষয়ে অন্যায় ও অসাম্য, বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রাহক ইংরেজ কালেক্টারদের অত্যাচার এবং তৃতীয়, কোম্পানীর আগ্রাসী নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গ তথা ভারতীয় জনমানসে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

রবার্টস নতুন প্রজন্ম বলতে ঠিক কাদের বুঝিয়েছেন তা' তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে তারা যে তরুন মুসলমান এ ধারণা করা খুব অসংগত হবে না। কারণ ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহী তরুন হিন্দু সমাজ (যা' ছিল মুসলমানদের কাছে বিধর্মীর ভাষা) ইংরেজ শাসনে সম্ভাব্য চাকুরীর স্বর্ণ-মৃগর স্বপ্ন সে সময়ে দেখছিল। তরুণ মুসলমানরা অতীত মুঘল-গৌরবে

গৌরবান্বিত বোধ করে ইংরেজ শাসনের প্রতি একটা আক্রোশ বোধ করবে এতে আর বিচিত্র কী! তাই এরা যেমন ওয়াহাবী মতবাদীদের ইংরেজ বিরোধী প্রচারে প্রভাবিত হয়ে নানা সন্ত্রাসবাদী কাজে প্রবৃত্ত ছিল তেমনি এদের যারা সিপাহী হিসেবে ইংরেজ বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে ছিল তারাও নানা ভাবে আনুগত্যের বন্ধন শিথিল করতে বদ্ধপরিকর ছিল। এই সব তরুণেরা বিগত দিনের নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক সুবিধার গল্প-কথার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল—ধর্মের উসকানী ছিল নিতান্তই অজুহাত। এ কারণেই বোঝা যায় মহরমের মিছিল বের করতে না দেয়ার সত্যাসত্যতা ভাল করে যাচাই না করেই কেন হায়দ্রাবাদের বোলারামে ১৮৫৫ সালে থার্ড ক্যাভেলরীর মুসলমানরা কর্ণেল ম্যাকেঞ্জীর উপর চড়াও হয়েছিল। যদিও ম্যাকেঞ্জী মহরমের আগের দিনই মিছিল বার না করার আদেশ প্রত্যাহৃত করে নিয়ে ছিলেন। (সেন, পৃঃ ১৩) শুধু সিপাহী নয়, বিপ্লবী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ এক মুসলমানের হাতে ১৮৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ফ্রেডারিক ম্যাকসন পেশোয়ারে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। ১৮৫৯ সালের গোড়ায় জন বীমস পাঞ্জাব প্রদেশে সিবিলিয়ানের চাকুরী নিয়ে এলেন। তাঁকে ডেপুটি-কমিশনার অ্যাডমস মুসলমান আততায়ীদের থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। অবশ্য অ্যাডমস নিজেই অল্প কিছু কাল পরে এক মুসলমান বিপ্লবীর হাতে নিহত হন। এমন কি ১৮৭১ সালে আন্দামানে খোদ ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এক আফগান মুসলমানের হাতে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন।

দ্বিতীয়তঃ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে রবার্ট্স যে অন্যায়, জুলুমের কথা বলেছেন তা' কোন পর্যায়ে পৌছেছিল যখন দেখি ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহে জনসাধারণের প্রথম কাজই ছিল বন্ধকী দলিল, হাত-চিট প্রভৃতি কাগজে অগ্নি সংযোগ। কোনো একটি রেভেনিউ অফিস আক্রমনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

তৃতীয়তঃ রবার্ট্স কথিত কোম্পানীর আগ্রাসী নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গ তথা জনগণের মনে যে আতংকের সৃষ্টি করে ছিল তার সমর্থন রমেশচন্দ্র মজুমদারের আধুনিক গবেষণা থেকেও পাওয়া যায়। মজুমদার লিখছেন। "ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর জনগণ পুরোপুরি অসন্তুষ্টও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে ছিল।" (মজুমদার, পৃঃ ৪৯৭)

১৮৫৭ সালে বিদ্রোহে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে আজমগড় ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছিল তাদের শ্রেণীগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে দেশের কোন কোন শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে অসন্তুষ্ট ছিল। মনে রাখা দরকার আবেদন বা আহ্বান সাধারণতঃ তাদেরই জানানো হয় যাদের বিদ্রোহে যোগদানের কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে। (সেন, পৃঃ ৩৬)

ঘোষণাপত্রে জমিদারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল :—"এটা সবাই জানে যে ইংরেজরা চড়াহারে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করার ফলে আপনাদের সর্বনাশ হয়েছে।" ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল :—"আপনি বিলক্ষণ জানেন যে বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশরা নীল, অহিফেন প্রমুখ লোভনীয় ব্যবসাগুলি একচেটিয়া করে নিয়েছে আর আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছে কম-লাভের ব্যবসাগুলি।" সরকারী কর্মচারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, 'অসামরিক এবং সামরিক বিভাগের কম লোভনীয় এবং নিম্ন পদ মর্যাদা যুক্ত চাকুরিগুলি দেয়া হয় দেশীয়দের আর মোটা মাহিনে এবং উচ্চ মর্যাদা যুক্ত চাকুরিগুলি দেয়া হয় কেবল ইউরোপীয়দের।" কারিগরদের বলা হয়েছিল যে "তারা নিশ্চয় জানে সামান্য কিছু বানিজ্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাকি সব দ্রব্য ইউরোপীয়ানরা ইউরোপ থেকে আমদানি করে। এবং সবশেষে পণ্ডিত আর মৌলভীদের কাছে আবেদন জানানো হলো" "ব্রিটিশরা আপনাদের ধর্মের বিরোধী, আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করুন।" ঘোষণাপত্রটির তাৎপর্যজনক বৈশিষ্ট এই যে সমাজের জমিদার, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, কারিগর এবং ধর্মীয় শিক্ষক অর্থাৎ মৌলভী ও পণ্ডিতদের উল্লেখ থাকলেও দেশীয় রাজন্যবর্গের কোনো উল্লেখ ছিল না। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে বিদ্রোহী সিপাহীদের সবাই কিছু সামন্ত নৃপতিদের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে ছিল বা ইংরেজ বিরোধী লড়াইতে তাদের সঙ্গে পেতে চেয়ে ছিল। অন্ততঃ এই ঘোষণাপত্র প্রচারকারী বিদ্রোহী ১৭ নং নেটিভ ইনফেন্টি তো নয়ই। (সেন, পৃঃ ১৮৭) লক্ষ্যনীয় এই ঘোষণাপত্রের মূল আহ্বান ছিল সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে। যেমন, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, কারিগর ও শিক্ষক। অর্থাৎ বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষনে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং এদের কাছে ধর্মের নামে আবেদন খুব একটা আগ্রহ সৃষ্টি করবে না। বরং ওই

ঘোষণাপত্রে জমিদার ও ব্যবসায়ীদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে কিভাবে সামান্য বিচার চাইতে গেলে প্রচুর টাকার "ষ্টাম্প কাগজ এবং কোর্ট ফি" ব্যয় করতে হচ্ছে। আর সবশেষে, এতদিন ধরে পণ্ডিত আর মৌলভীরা যে সব নিষ্কর জমি ভোগ করে আসছিলেন সেগুলি ইনাম কমিশন মারফত যখন যথাযোগ্য প্রমাণ না থাকার অজুহাত দেখিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হল তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমানের সাথে বিদ্রোহীরা তাঁদের 'ধর্মে'র জুজু দেখিয়ে উত্তেজিত করল। কারণ বাস্তব পরিস্থিতিই পণ্ডিত আর মৌলভীদের ইংরেজ বিরোধী করে তুলে ছিল। বিদ্রোহের শেষের দিকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৮ অযোধ্যার বিরজিস কাদেরের নামে হজরত মহল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেয়া প্রতিশ্রুতির (ঘোষণাপত্র, নবেম্বর, ১৮৫৮) জবাবে যে যে ঘোষণাপত্র জারী করেছিলেন—যার উদ্দেশ্য ছিল সিপাহী ও জনসাধারণের মানসিক বলবৃদ্ধি করা—তাতে তিনি সবশেষে যে বিষয়টির উপর জোর দিয়ে ছিলেন সেটি হচ্ছে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভাল চাকুরীর দাবী। ঘোষণাপত্র দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :—"এটা একটু ভেবে দেখা দরকার যে হিন্দুস্তানীদের জন্য তারা (ইংরেজরা) রাস্তা নির্মাণ আর কূপ খননের চেয়ে ভাল কোন চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি।" (সেন, পৃঃ ৩৮৪)

মহাবিদ্রোহ মিরাটে ১০ই মে, ১৮৫৭ শুরু হয়ে দ্রুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নর্মদা এবং পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমে রাজপুতানা পর্যন্ত। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, দোয়াব, বুন্দেলখণ্ড, মধ্যভারত, বিহারের ব্যাপক অঞ্চল এবং পূর্ব পাঞ্জাবে বস্তুতঃ ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটেছিল। স্থানীয় ভিত্তিতে হায়দ্রাবাদ ও বাংলা দেশেও বিদ্রোহ দেখা গেছল। এ ছাড়া আসাম, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও "অস্থিরতার চিহ্ন" ছিল সুস্পষ্ট। ৯ই জুন ফৈজাবাদে বিদ্রোহী সুবাদার প্যারেডের সময়ে সগর্বে ঘোষণা করলেন, "কোম্পানী রাজ খতম হয়েছে" এ সত্ত্বেও একটা বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনার তাৎপর্য নিছক আয়তনের অঙ্ক কষে পাওয়া যাবে না। ১৯৩৪ সালে মাও সে তুঙ যখন চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে হুনান এবং কিয়াংসি প্রদেশ নিয়ে মুক্ত অঞ্চল গঠন করেন তখন তার জনসংখ্যা ছিল মোট চীনের ষাট কোটী লোকের মধ্যে মাত্র নব্বই লক্ষ। সুতরাং যদি ধরেও নেয়া যায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত অনুযায়ী প্রকৃত স্বাধীন অঞ্চল

কেবল রোহিলখণ্ড এবং যমুনা নদীর দক্ষিণের কাছ বরাবর ছিল তাহলেও বিদ্রোহ যে মহাবিদ্রোহের রূপ নিচ্ছিল এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না। মনে রাখা দরকার সামান্য কিয়াংসি প্রদেশ থেকেই চীনের ঐতিহাসিক লঙ মার্চের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, যার সফল পরিণতি ঘটেছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের ভেতর দিয়ে। আবার এটাও লক্ষ্যনীয় যেখানে ১৮৭১ সালে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রানিত প্যারী কমিউন (৮ই মার্চ ২৮শে মে) মাত্র দু'মাস টিঁকে ছিল সেখানে কেবল ব্রিটিশ বিরোধীতাকে সম্বল করে নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ সামনে না রেখে মুক্ত দিল্লী টিঁকেছিল চার মাসেরও (১১ই মে' ২০শে সেপ্টেম্বর কিছু বেশি। কম্যাণ্ডার ইন চীফ অ্যানসনের কাছে দিল্লী পুনর্দখল করা ছিল রীতিমত এক সমস্যা। লর্ড রবার্টস যিনি দিল্লীর লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মতে বিদ্রোহী সিপাহীরা ছিল "সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত এবং জীবনপণ লড়াই করতে" প্রস্তুত। শুধু তাই নয় স্বাধীন দিল্লীর শাসন ও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার জন্য একটি "কোর্ট" বা সামরিক—অসামরিক পরিচালক কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। এর মধ্যে ছ'জন নির্বাচিত হয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী থেকে—যথাক্রমে দু'জন করে পদাতিক, ঘোড়সওয়ার এবং গোলন্দাজ বাহিনী থেকে। এঁরা দেখবেন সামরিক কাজকর্ম আর অসামরিক কাজকর্ম দেখার জন্য নির্বাচিত হবেন চারজন অসামরিক ব্যক্তি। এই কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন এবং তাঁর হাতে একটি বাড়তি ভোট থাকবে। কোর্টের সিদ্ধান্ত কম্যাণ্ডার ইনচীফের অনুমতি ছাড়া প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য কোর্টের কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন। কোর্ট যদি তাতে সম্মত হয় তাহলে চূড়ান্ত মতামতের জন্য সম্রাটের কাছে পাঠানো হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সবাইকে মেনে নিতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ সেন ফলাফলের দিক থেকে কোর্টকে ব্যর্থ বললেও এর গঠন-পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক বলে রায় দিয়েছেন। (সেন, পৃঃ ৭৫) এটা খুবই লক্ষ্যনীয় যে দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহী এবং জনসাধারণের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে গণতান্ত্রিকতার দিকে প্রসারিত হচ্ছিল। তাই শাসক হিসেবে সম্রাটের চরিত্রও স্বৈরতন্ত্র থেকে সাংবিধানিক নিয়মতন্ত্রের পথে পা' বাড়িয়েছিল।

আবেদন, দরখাস্ত সব সম্রাটের নামেই করা হোত তবে তিনি সেগুলি পাঠিয়ে দিতেন কোর্টের কাছে। সম্রাটের নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। কোর্টের সংবিধানের দু'টি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। এক, আজও যখন দেখি বিভিন্ন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র প্রধানের আইনসভার জন্য কিছু সদস্যের মনোনয়ন দান তখন বিস্মিত হতে হয় কোর্ট সম্রাটকে এধরণের কোনো ক্ষমতা দেননি দেখে। দ্বিতীয়, ইংলণ্ডের রাজা যেমন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনানায়ক, বাহাদুর শাহ সে রকমও ছিলেন না।

কোর্ট তার স্বল্পকালীন আয়ুষ্কালে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যেমন, পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ধনী-দরিদ্রের বিচার করে ট্যাক্স বসানো, মুনাফাখোর ও মহাজনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা প্রদান। এই সব সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো মিল পাওয়া যাবে না।

সুরেন্দ্রনাথ সেনেব মতে কোর্ট কোনো বিশৃঙ্খলা দমন করতে পারেনি। তবে তিনি বলেছিন কোর্ট তাব কাজ দিল্লীর পুণর্দখল পর্যন্ত চালু রেখেছিল। (সেন, পৃঃ ৭৫)

একথা অনস্বীকার্য দিল্লীর আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন কোর্টের সামনে সমস্যাও ছিল জটিল ও বিশাল। নগরীব তিন নেটিভ ইনফেন্টি ও একদল গোলান্দাজ বাহিনীব সাথে হাত মিলিয়ে ছিল মিরাট থেকে আসা দু'হাজার সৈন্য। তারপব ক্রমশঃ পৌছোতে লাগল জলন্ধর, নাসিবাবাদ, নিমচা, কোটা, গোয়ালিয়ব, ঝাঁন্সি এবং রোহিলখণ্ড থেকে আরো কয়েক হাজাব বিদ্রোহী বাহিনী। এদের মধ্যে প্রথম যে সমস্যাটি দেখা দিল তা'হল পারস্পরিক বোঝাপডা। অন্যদিকে দিল্লীর দেড়লক্ষ বাসিন্দার সাথে মিলিত হয়েছিল আশে-পাশের গ্রামবাসী যারা নদীপথে আসা-যাওয়া অব্যাহত রেখেছিল। (কোলিয়ার, পৃঃ ৮৫) এদের মধ্যে নিশ্চয় সৎ, অসৎ, দেশপ্রেমিক, দেশদ্রোহী সব রকমের লোকই ছিল। তারপর ১১ই মে দিল্লীর লড়াইতে যে সমস্ত নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—যাদের মধ্যে বহু ছোটো-খাটো দোকানদার ছিল তারা ক্ষতিপূরনের জন্য অবিলম্বে পীড়াপীড়ি করছিল। ইতিমধ্যে আবার কোর্টের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিরোধ লাগল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বেরিলীর বখত-খাঁর সাথে নিমক ও নাসিরাবাদ বাহিনীর। শেষোক্তপক্ষে যোগ দিলেন

বাহাদুর শাহ'র পুত্র, মীর্জা মোগল। প্রশাসনিক সমস্যাও ছিল দুস্তর। দিল্লী থেকে মিরাট পর্যন্ত সদ্য স্বাধীন চল্লিশ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে দ্রুত সম্রাটের শাসন কায়েম করতে হবে। তার উপর ইংরেজরা দিল্লী পুনর্দখলের চেষ্টা করলে (যা' তারা করবেই) তার উপযুক্ত জবাবের জন্য দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা আশু গড়ে তোলারও প্রয়োজন। এদিকে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকেও বিনা সমাধানে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সর্বোপরি ব্যাংকার বা মহাজনদের তরফে আর্থিক সাহায্য প্রদানে অনিচ্ছা।

সুতরাং বোঝাই যায় এধরণের ব্যাপক ও বহুমুখী সমস্যার সরল সমাধান মাত্র চার মাসেব মধ্যে করা কখনোই সম্ভব নয়। ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতের অভূতপূর্ব সমস্যার কেবল লাগাম ধরতেই কংগ্রেস সরকারের প্রায় দেড বছর লেগে গেছল। স্পীয়ার লিখেছেন, "১৯৪৮ সালের শেষ নাগাদ কংগ্রেস সরকার···নিজেদের পদ সম্পর্কে নিশ্চিত হন।" ১৭৯৩ সালে বাহিরের এবং ভেতরেব শত্রুদের হাত থেকে ফরাসী দেশ ও বিপ্লবকে বাঁচাতে রোপসপীয়র ও জ্যাকবাঁদের লেগেছিল কম পক্ষে সাত মাস (সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩-মার্চ, ১৭৯৪)। তা'ও নির্মমভাবে প্রতিপক্ষকে হত্যা করে। দিল্লীর কোর্টের প্রতিনিধিবা সে সময়টুকুও পান নি। তবে সুরেন্দ্রনাথ সেনের কথা অনুযায়ী দিল্লী যদি বিশৃঙ্খলাব মধ্যেই ডুবে থাকত তবে তার পক্ষে কি উপযুক্ত একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল? যা' রবার্টসের কথায় "দিল্লী আমাদের দেখেই তার দরজা খুলে দেয়নি। প্রায় তিন মাসের উপর আমাদের দখল করার সব ধরণের প্রচেষ্টা সে অগ্রাহ্য করেছে।" (রবার্টস, পৃঃ ১০২) রবার্টসের উপরোক্ত মন্তব্যের পবিপ্রেক্ষিতে বখত খাঁর কড়া নির্দেশগুলির ফল প্রসূতা ও বিচার করা প্রয়োজন। পুলিশ প্রধানকে আদেশ দেয়া হয়েছিল শহরে যদি ব্যাপক লুঠ-তরাজ ঘটে তা হলে তাঁকেই তার জিম্মাদার হতে হবে। দোকানদাররা যাতে করে লুঠেরাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার জন্য তাদের অস্ত্র রাখার চালাও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কোনো সিপাহীকে লুঠ করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করলে তার অঙ্গচ্ছেদনের আদেশ দেয়া হল। লডাইতে অংশ না নিলে সিপাহী তার দিনের বেতন পাবে না। তাদের প্রতি কড়া হুকুম ছিল "যাও, লড়!" (কোলিয়ার, পৃঃ ১৯৩-৯৪) এটা তাৎপর্যজনক, দিল্লীর লড়াইতে অংশ-গ্রহনকারী লর্ড রবার্টস শহরের মধ্যে অসন্তোষের কথা বললেও দিল্লীর

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রায় নীরব। পনেরোই থেকে বিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যখন ইংরেজ বাহিনী শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তখন তাদের অলিতে গলিতে, ছাদের উপর থেকে স্নাইপারদের গুলীর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এটা কখনোই সম্ভব ছিল না যদি না সাধারণ নাগরিক ও সিপাহীদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকতো। বিশৃঙ্খল, অরাজকঅবস্থায় এসম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

সব শেষে আশ্চর্য লাগে যদি কোর্ট কার্যক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতাই প্রমাণ থাকে তাহলে দিল্লীর পতন পর্যন্ত রোজ নিয়ম করে পাঁচ ঘণ্টা অধিবেশন তার কি কারণে চালু ছিল? (সেন, পৃঃ ৬৫-৭৬)। বাহাদুর শাহ'র কোনো সক্রিয় ক্ষমতা ছিল না। সবই কোর্টের মাধ্যমে সিপাহরা চালাত।

আসলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কোর্টের কোনো আন্তরিকতার অভাব ছিল না, ছিল অভিজ্ঞতার। তারা যেমন জ্যাকবাঁদের মত নির্মমও হতে পারেনি তেমনি কমিউন গঠনের মত কোনো বিপ্লবী দর্শনও তাদের পরিচালিত করেনি। তারা চেয়ে ছিল কেবল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। অতএব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা তো থাকবেই—তবে সেই সাথে তার মাত্রাটাও বিচার করা উচিত। কারণ মনে রাখা দরকার ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের বিপ্লবে খোদ জুন মাসে প্যারী শহরে দশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। বিপ্লবী আর প্রতি বিপ্লবীদের লড়াইতে।

যে ভাবে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল তাতে স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় কেবল সিপাহীদের বন্দুকের দ্বারা এত বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ছিল না। প্রমোদ সেনগুপ্ত ১৮৫৭র ঘটনাবলী থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহের শিক্ষাটিকে ধরতে চেয়েছেন। (সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪৯) কিন্তু মাও-সে তুঙর সেই সুপরিচিত উক্তিকে আরেকবার স্মরণ করে বলা যায় সর্বশেষ বিশ্লেষণে লড়ে বন্দুক নয়, জনগণ। আর সেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের রূপ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখে রমেশচন্দ্র মজুমদার "হিষ্ট্রি অব ফ্রিডম ম্যুভমেণ্ট" এ মন্তব্য করেছেন যে এর সংক্ষিপ্ততম বর্ণনাও একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার বইতে দেয়া সম্ভব নয়। যা' উত্তর প্রদেশে—তা' মধ্য ভারতেও। আবার ম্যালেসনের মতে "বিহারের পশ্চিম ভাগে এবং পাটনা বিভাগের বহু জেলায় সিপাহীগণ ও জনসাধারণ একই সময়ে অভ্যুত্থান শুরু করেছিল।" বিপানচন্দ্র বলছেন উত্তর প্রদেশ

ও বিহারে কৃষক এবং কারিগররা যোগ দেয়ার ফলে বিদ্রোহ এক অভ্যুত্থানের শক্তি ও চরিত্র নিয়ে ছিল। এসব জায়গায় কৃষক আর পুরানো জমিদাররা সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করে ছিল মহাজন আর নতুন জমিদারদের—যারা ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের জমি থেকে উৎখাৎ করেছিল। প্রধান আক্রোশের স্থল ছিল আদালত গৃহ, তহশীলদারের অফিস; পুলিশ চৌকি আর রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ-পত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওগুলো ভস্মীভূত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ এর প্রতিটি গ্রাম এবং বাড়ী ব্রোকের ভাষায় এক একটি গ্যারিসন বা সামরিক শিবিরে পরিণত হয়েছিল। (ব্রোক, পৃঃ ১৮২-৮৩) তাই কানপুরে পলায়নমান ইংরেজদের মাল বহনকারী কুলির সন্ধান বাজারে মেলেনি (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ৮৩-৮৪)। জেনারেল হ্যাভলক নদী পেরোনোর জন্য মাঝি খুঁজে ফিরেছেন আর লর্ড রবার্টস লিখেছেন দিল্লী পুর্ণদখলের সময়ে ইংরেজদেব রসদ বহনকারী গাড়ী জোগাড করাই ছিল মুশকিল। কোথাও আবার জনগণ সিপাহীদেব চেয়েও এগিয়ে এসেছিল। ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরেব মাঝামাঝি মিঞাগঞ্জেব লড়াইতে আট হাজার যোদ্ধাব মধ্যে সিপাহীর সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজাব আর বাকি সাত হাজার ছিল ম্যালেসনেব মতে আশে পাশের গ্রামের কৃষক। মহাবিদ্রোহে নিহত অযোধ্যার দেড় লক্ষ লোকের মধ্যে এক লক্ষই ছিল সাধাবণ মানুষ। গয়া জেলার অনেক জায়গাতেই ছোটো-খাটো দোকানদার, ব্যবসায়ীরা কোম্পানীকে ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে পালামৌ, সিংভূম এবং উড়িষ্যার সম্বলপুরে বিদ্রোহ-গণ অভ্যুত্থানের চেহারা নিয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তেব পেশোয়ারে সাধারণ মানুষের আনুগত্যের উপরও ইংবেজরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। লর্ড রবার্টস স্বয়ং একথা স্বীকাব করেছেন। পূর্ব পাঞ্জাবের গণরোষের চিত্র সরকারী অফিস সমূহ ভস্মীভূত করার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। কার্ণাল জেলার জাঠ কৃষকরা রাজস্ব দেয়া বন্ধ করে দিল। (ফ্রিডম. মুভ, পৃঃ ১৭৫-৭৬) এও দেখা গেছে জনসাধারণ সিপাহীদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করছে। মীরাট, উত্তর প্রদেশের আলিপুরে এ দৃশ্য দেখা গেছে। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন লক্ষ্ণৌতে কমিশনারের গৃহ ভৃত্য আর তার গ্রামবাসীরা সিপাহীদের সাথে গোপনে শলা পরামর্শ করেছেন (পৃঃ ৪২)। আলিগড়ে সিপাহীদের উত্তেজিত করার অপরাধে এক ব্রাহ্মণের প্রকাশ্যে ফাঁসী দেয়া হল। ফল

হল উল্টো। প্রতিবাদে সিপাহীরা ব্যারাক থেকে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল। (ধরমপাল, পৃঃ ৫৫) ফৈজাবাদের মৌলভী তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ই ঘোষনা করলেন।

একটা জিনিষ লক্ষ্যনীয় যে মহাবিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহীরা মিরাট, কানপুর, অযোধ্যা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ কারাগার থেকে বহুবন্দী মুক্ত করে দিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ইংরাজ ঐতিহাসিকদের সাথে একমত হয়ে এদেব অপরাধী, গুণ্ডা বলে মন্তব্য করেছেন। (মজুমদার পৃঃ ৪৭৩, ৫০৩) সাম্রাজ্যবাদী বা নির্যাতনকারীদের কারাগারে চোর-ডাকাতের সাথে দেশ-প্রেমিকরাও থাকে একথা না বললেও চলে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বাস্তিলে সাধারণ অপবাধীদেব সাথে রাজদ্রোহীবাও ছিল। মহাবিদ্রোহের সময়ে ফৈজাবাদেব জেল থেকে মৌলভী আহমেদউল্লাও ছাড়া পেয়েছিলেন—যাঁকে দ্বিধাহীনভাবে ম্যালেসন "দেশপ্রেমিক" আখ্যা দিয়েছেন। (সেন, পৃঃ ১৮৬) লক্ষ্ণৌ দখলের পব জেল থেকে সিপাহীরা যাদের মুক্তি দিয়েছিল তাদেব মধ্যে নিশ্চয় ৩১শে মে' যে পাঁচ, ছ' হাজাব লোকের বিদ্রোহ পুলিশ দমন করেছিল তারাও ছিল। (মজুমদাব, পৃঃ ৫৩৬) প্রিচার্ড তাঁর "দি মিউটিনিজ ইন রাজপুতানা" গ্রন্থে ইংরাজ আদালত আর বিচাবকের দুর্নীতি সম্বন্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যায বিচাব সম্পর্কে আগ্রাব তদানীন্তন সদর আদালতের বিচাবক বাইকসেবও মনোভাব এক প্রকাব। (সেন, পৃঃ ৩২) ১৮৪৩ সালে জর্জ থমসনের ভাবত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খুবই বিষাদময়। তিনি পুলিশ অফিসারদের ঢালাও ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। একজন পুলিশ অফিসার বিনা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির "সাক্ষ্য বা শপথ না নিয়েই তাকে গ্রেপ্তাব করা, চাবুক মারা, অর্থদণ্ড দেয়া এবং জেলে বন্দী" করতে পারে। মজুমদার থমসনের উক্তির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। (মজুমদার, পৃঃ ৪০০) তাহলে একথাও যুক্তি সঙ্গত ভাবে বলা যায় যে মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে ইংরেজ কারাগারে অপরাধীদের চেয়ে নিরপরাধীদের সংখ্যাই বোধ হয় বেশি ছিল। কারণ ইংরাজদের নীতিই ছিল "জেলখানাকে একটা কষ্টদায়ক জায়গায় পরিণত" করে (স্যারজনষ্ট্র্যাচির মন্তব্য) বন্দীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। (মজুমদার, পৃঃ ৪০১) মিরাট জেল থেকে মহাবিদ্রোহের সময়ে যে সব কয়েদীরা মুক্তিপায় তাদের মধ্যে ৮৫ জন সিপাহী এবং চারহাজার অন্যান্য কয়েদী ছিল। (সেনগুপ্ত পৃঃ ৭৩) কেই রামদয়াল নামে এক ব্যক্তির

উল্লেখ করেছেন যিনি আটক হয়েছিলেন খাজনা দিতে পারেননি বলে। মজঃফরনগর, সাহারানপুর প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় সিপাহীরা নয় জনসাধারণই এগিয়ে এসে কারাগার ভেঙে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। লর্ড রবার্টস লিখছেন বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কারাগার ভাঙা। (রবার্টস, পৃঃ ২৬৭)

মহাবিদ্রোহে সাধারণ মানুষের ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সব স্থানে গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি সে সব স্থানেও বিদ্রোহের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। বিদ্রোহীদের সাফল্যে সাধারণ মানুষ উল্লাস প্রকাশ করেছে। যারা ইংরেজ বাহিনী পরিত্যাগ করেনি তারা সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতি জনগণ সক্রিয় বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে। কোনো রকম সংবাদ দিতে অস্বীকার করেছে এবং কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভুল সংবাদ দিয়ে বিপদে ফেলেছে। কোলিয়ার লিখছেন, এমনকি ডেপুটি কমিশনারের অফিসের অনেক বেয়ারা বিদ্রোহীদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করেছে। এদের কাজছিল অফিসে যারা আসছে তাদের উপর লক্ষ্য রাখা। লক্ষ্ণৌর ছাব্বিশ মাইল দূরের তিলোউই গ্রামের সুবাদার সীতারাম পাণ্ডে লক্ষ্য করেছিলেন গ্রামের লোকে তাঁকে "জনকোম্পানী"র গুপ্তচর মনে করে সব সময়ে তফাতে রাখছে। (কোলিয়ার, পৃঃ ১৫৯-১৬০) সাধারণ মানুষের ঘৃনার দৃষ্টি ইংরেজ সৈনাধ্যক্ষ স্যারহেনরী হ্যাভলকেরও চোখ এড়ায়নি। ১৮৫৭ সালের ৭ই জুলাই তিনি যখন এলাহাবাদে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছেন তখন তিনি সবিস্ময়ে দেখেছেন কিভাবে হিন্দুরা আতঙ্কের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে আর মুসলমানদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃনার বিকৃতি! (ব্রোক, পৃঃ ১৫৫)

গ্রাম শহরের সাধারণ মানুষের এই ঘৃনা ও বিরোধীতা ইংরাজরা সহ্য করতে পারেনি। কারণ একই সঙ্গে তাদের বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের সক্রিয় বিরোধীতার মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। হতাশাগ্রস্ত, জাতি বিদ্বেষে ভরপুর ইংরাজ সৈন্যরা একটার পর একটা গ্রাম পুড়িয়ে দিতে লাগল। লুঠ করল শহরের পর শহর। তাদের আরো বেশি অত্যাচারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালো কলকাতা ও লণ্ডনের স্বদেশবাসীরা। ৩রা অক্টোবর, ১৮৫৭ সালে লণ্ডনের "পানচ" পত্রিকা ব্রিটিশ সৈন্যদের উপদেশ দিল "নিগারদের এই লড়াই সংক্ষিপ্ত কর" কলকাতার "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" ৩শে

জুলাই, ১৮৫৭ সম্পাদকীয় কলমে "গর্জে" উঠল "আমরা আমাদের সামনে বিদ্রোহীদের উৎখাত করব। পেছনে কিছুই রেখে যাব না—এক অগ্নিদগ্ধ গ্রাম আর দড়িতে ঝোলানো বিশ্বাসঘাতকদের মৃত দেহ ছাড়া।" (গুপ্ত, পৃঃ ১২৪-২৫)

সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের ঘটনাকে রমেশচন্দ্র মজুমদারও অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর মতে "ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল।" তবে তিনি মনে করেন যেখানে যেখানে সিপাহীরা সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছে কেবল সেখানে সেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে "এক গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল।" (মজুমদার, পৃঃ ৪৯৭) অর্থাৎ গণ-অভুত্থান সিপাহীদেব সাফল্যের দিকে যেন তাকিয়ে বসেছিল। অথচ মহাবিদ্রোহের ঘটনা প্রবাহ সর্বত্র মজুমদারের উক্তির সাক্ষ্য বহন কবে না। বহু স্থানে জনসাধারণ নিজেরাই এগিয়ে এসে ছিল। মজঃফবনগব, সাহারানপুবে সিপাহীদেব পূর্বে জনসাধাবণ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধবেছিল। ৩১শে মে' লক্ষ্ণৌতে সিপাহীরা বিদ্রোহ করাব পূর্বেই ছ' হাজাব মুসলমান ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিরাট মিছিল বের করেছিল। ব্রুস নটন ১৮৫৮ সালে তাঁর প্রকাশিত পুস্তক "টপিক্স ফব ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান" এ এই মহাবিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহীদেব বিদ্রোহ বলতে বাজী হননি—তাঁর মতে এটি ছিল এক গণবিদ্রোহ। (মজুমদাব পৃঃ ৫৩৬, ৬০৩) যে সব ইংবেজ অফিসাররা সে সময়ে একে কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে চালাতে চেষ্টা কবেছেন তাঁদেব তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরই মত সমসাময়িক আরেক ইংরেজ অফিসার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মার্ক থর্ণহিল মনে করেন এই সব ভুল ব্যাখ্যা করে ওইসব ব্যক্তিরা সামরিক - অসামরিক ইংরেজ অফিসারদের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন। কেননা এর ফলে বিনা প্রয়োজনে "বহু অর্থ ও জীবন" ইংরেজদের দিতে হয়েছে। (রবার্টস, পৃঃ ২৮০)

ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইতে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিশেবে ভারত-বাসীর আত্মপ্রকাশে মহাবিদ্রোহের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন বিদ্রোহীরা জনসাধারণের প্রতিটি অংশ থেকে এসেছিল। শিখ আর আফগানরা শুধু ইংরেজদের পক্ষে লড়াই করেনি তারা বিদ্রোহীদের পক্ষেও লড়াই করে ছিল। শিখদের যদি দেখা যায় দিল্লীর অভ্যন্তরে তবে

আফগানদের দেখা গেছে ধার এবং মান্দিসোরে। তেমনি পূর্ব ভারতে সাঁওতালরা, অযোধ্যায় পাসীরা এবং রাজপুতানা ও মধ্যভারতে ভীলরা। এ ছাড়াও উত্তরভারত ও পাঞ্জাবে গুজর, মেওয়াতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাঠরা বিদ্রোহে যোগ দিলেও সুরেন্দ্রনাথ সেন তাদের শুধু লুণ্ঠনকারী হিশেবে অভিহিত করেছেন। অথচ তিনি অন্যত্র জানিয়েছেন সাহারানপুর জেলায় গুজররা ইংরেজদের অস্বীকার করে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল। (সেন, পৃঃ ৪০৭) থানেশ্বর জেলায় ইংরেজ বিরোধীতার জন্য গুজরদের পাইকারী ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এটা তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনা যে, যেখানে যেখানে গুজর, বানজার, মেওয়াতি, জাঠ, চৌহান প্রমুখ উপজাতিরা বিদ্রোহ করেছে—যাদের প্রধান উপজীবিকা চাষ-আবাদ—সেখানেই তাদের আক্রমনের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে ইংরেজের তহশীল বা রাজস্বদপ্তর। (ফ্রিডম মুভ পৃঃ ১৫৯) বেনিয়া, মহাজনবাও নিস্তার পায়নি। (মজুমদার, পৃঃ ৫২৪) অথচ সুরেন্দ্রনাথ সেনের দৃষ্টিতে গুজররা ছিল "আইন ভঙ্গকারী" (সেন, পৃঃ ৫৯) আর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "হামলাকারী উপজাতি" (মজুমদার, পৃঃ ৬১৩)। এলিজাবেথ হোয়াইকম্ব অবশ্য ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর "এগ্রেরিয়ান কনডিশন ইন নর্দান ইণ্ডিয়া" বইতে ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের কৃষিকর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে গুজরদের কৃষিজীবী বলেই বর্ণনা করেছেন, কোথাও বলেননি যে তারা আইন ভঙ্গকারী বা হামলাকারী ছিল। (পৃঃ ৮৪-৮৫) উল্লেখ্য বিদ্রোহের পূর্বে মিরাটের ইংরেজ নিযুক্ত কোতয়াল ধন্না সিং ছিলেন একজন গুজর। (সেন, পৃঃ ৬২) শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁর। একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। একথা যদি মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে সত্য হয় তাহলে তার ফলশ্রুতি হিশেবে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি। মহাবিদ্রোহের সময়ে তাই ঘটেছিল। মৌলানা আজাদ "এইটিন ফিফটি-সেভেন" বইটির ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে এটি খুবই তাৎপর্যজনক যখন মহাবিদ্রোহের দিনগুলিতে মানুষ মরিয়া আর উত্তেজিত তখন "কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটেনি।" (আজাদের ভূমিকা ; সেন, পৃঃ XVII-XVIII) তাঁর মতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে বিগত একশো বছর ধরে (১৭৫৭-১৮৫৭) দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃনার ভাব জাগিয়ে তোলার বহু চেষ্টা হয়েছে। টডের "রাজস্থান

কাহিনী" বা ইলিয়টের "ভারতের ইতিহাস" প্রমুখ বইয়ের দ্বারা হিন্দুদের মনে মুসলমান শাসন সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টার কোনো কসুর করা হয়নি। কিন্তু তবু তারা ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৫৭-র সংগ্রাম "সাম্প্রদায়িক রূপ নিল না।" তবে মৌলানা আজাদ এর কৃতিত্ব বিদ্রোহের নেতাদের দিতে রাজী নন। তাঁর মতে এদের মধ্যে কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছিল না। তিনি মনে করেন এটা সম্ভব হয়েছে শতশত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমানের গড়ে তোলা ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের ফলেই।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এটি ছিল মুসলমানদের তরফে বিদ্রোহ। তিনি বেরিলীর খাঁন বাহাদুর খাঁনের ঘোষণাপত্রর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এতে ইঙ্গিত আছে হিন্দুরা পুরোপুরি চেষ্টা করছে না। অর্থাৎ হিন্দুদের তরফে উদ্যমের অভাব। তবে তিনি দিল্লীর ঘোষনাপত্র সম্পর্কে স্বীকার করেন যে এতে "সংগ্রামে দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান" জানানো হয়েছিল। তবু মজুমদারের ধারণা "সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত গভীর ছিল" যে এ ধরণের ঘোষণা পত্রের সাধু ইচ্ছা প্রকাশ তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। এরপর তিনি উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহরের সাম্প্রদায়িক হানাহানির এবং হিন্দুর দু'টি পবিত্র স্থান লুণ্ঠনের উদাহরণ দিয়েছেন—অবশ্য তারপরই তিনি আবার স্বীকার করেছেন, "এ ধরণের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সার্বিক ছিল না।" (ফ্রিডম মুভ, পৃঃ ২১৭) স্পষ্টই বোঝা যায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য স্ববিরোধীতা পূর্ণ। "সাম্প্রদায়িক মনোভাব সার্বিক ছিল না" মেনে নিয়েও তাঁর ধারণা "সাম্প্রদায়িক মনোভাব" খুব গভীর ছিল।" কিন্তু কি কারণে এই মনোভাব এত "এত গভীরে দৃঢ় প্রোথিত" হয়েছিল ("too deeply rooted") তার কোনো তথ্যগত ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য যে মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এ সত্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন। যা' রমেশচন্দ্র মজুমদারও পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি। সুদূর লণ্ডনে বসে বিদ্রোহের মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে লেখা কার্লমার্কসের ৩০শে জুনের প্রবন্ধেও এই সত্যটি ধরা পড়ে। তিনি লিখছেন: "এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে।" তারপর তিনি সরকার রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন,

"হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা' শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।" (মার্কস, পৃ: ৪১) তাহলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজ সরকারের প্রেরিত রিপোর্ট থেকে অন্ততঃ এ ধারণা করা যায় না রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা মত হিন্দুদের বিদ্রোহে উদ্যমের অভাব ছিল।

হিন্দু এবং মুসলমান বিদ্রোহীরা মহাবিদ্রোহের সময়ে একে অপরের ধর্মীয় ভাবপ্রবণতাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। যেখানেই বিদ্রোহ সাফল্যলাভ করেছে সেখানেই প্রথমে গো-হত্যা বন্ধের আদেশ জারী হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সামান্য বান্দা জেলার বিদ্রোহী নবাব আলী বাহাদুরও গো-হত্যা বন্ধের আদেশ জারী করতে এতটুকু দেরী করেন নি। (মজুমদার, পৃ. ৫২৮) দিল্লী দখলের পর বিদ্রোহীদের কাছে সমস্যা হল ইদের পরবে জুম্মা মসজিদে রীতি অনুযায়ী গো-হত্যা হিন্দুরা কিভাবে নেবে? লেফটন্যাণ্ট হডসনের দৃঢ় ধারণা ছিল এ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সিপাহীতে ভীষণ দাঙ্গা লাগবে। খাঁন বাহাদুর খাঁনের গো-হত্যা বন্ধের আদেশ বেরিলীর মুসলমানেরা মেনে নিলেও হডসনের বিশ্বাস দিল্লীর "মুসলমান ধর্মান্ধরা" একে মেনে নেবে না। আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ভার যাঁর হাতে সেই সম্রাট কাউকেই খুশী করতে পারবেন না। টিলায় অবস্থানরত ইংরাজ শিবিরে গুপ্তচর মারফত সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের সম্ভাবনার সংবাদে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিল এক চাপা উল্লাস। কিন্তু সম্রাটের ঘোষণা তাদের সব উল্লাস ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। জেনারেল এবং অন্যান্য অফিসারদের তিনি দৃঢ় ভাবে জানালেন, "শহরের মধ্যে ইদের দিন কোনো গো-হত্যা চলবে না। কোনো মুসলমান যদি এই কাজ করে বা কেউ যদি সাহায্য করে তা'র শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।" কর্নেল কিথ ইয়াং হতাশাগ্রস্ত চিত্তে এই ঘোষণার পরের দিনে তাঁর স্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন, "গতকাল ইদের পরব উপলক্ষে শহরে যে বিরাট দাঙ্গার আশা আমরা করেছিলাম, তা' দেখা যাচ্ছে পূরণ হল না।" (সেন, পৃ. ৯৩) কানপুরে নানা সাহেব ফৌজদারী আইনের নামে হিন্দু (মারাঠা) আইনের পুনঃ প্রবর্তন করলেন এবং সেই আইনের আওতা থেকে মুসলমানরা বাদ গেল না। তবু একেবারে অস্বীকার করা যাবে না কোথাও না কোথাও কোনো মুসলমান বা হিন্দু একে অপরের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু তারা কারা? ধর্মান্ধ না লুঠেরা—যারা যে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নেয়। একটা মহাবিদ্রোহ—লড়াই—

কিছু বিশৃঙ্খলা। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে। ডাঃ ত্রিভাগো প্রশ্ন করছেন, বিপ্লব আমাকে কি দিল—আমার পরিবার গেছে, শান্তি গেছে। ব্যক্তিবিশেষের এ ক্ষতি বৃহত্তর আন্দোলনে কিছু অস্বাভাবিক নয়। শুধু হিন্দু মুসলমানের হাতে নয় মুসলমানও হিন্দুর হাতে মারা গেছে। বিজনোরে ১৮৫৭ সালের মে' মাসের শেষে তেজপুরের চৌধুরী পরতাব সিং গোটা একটা মুসলমান গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। (সেন, পৃ. ৩৫১)। আবার মুসলমানের হাতেও মুসলমান মারা গেছে—যেমন হিন্দুর হাতে হিন্দু। ২৫শে সেপ্টেম্বর তহশীলদার মহম্মদ আলী নিহত হলেন আলীগড়ের বিদ্রোহী মুসলমান জমিদারের হাতে। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, "আশেপাশের জেলা থেকে লুঠেরারা এসে"—বিজনোরের মুসলমান বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়ে "হিন্দুদের পবিত্রস্থান হরিদ্বার, কংকলসহ কাছাকাছি জায়গাগুলো আগুন লাগিয়ে লুঠ করল।" মজুমদার, পৃঃ ৫২১) মজুমদার লিখছেন ম্যালেসনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ম্যালেসন মন্দির অপবিত্রকরণ বা মূর্তিভাঙ্গা সম্পর্কে নীরব—নইলে মজুমদার সে বিবরণও দিতে ভুলতেন না। যদি তীর্থস্থানই ধর্মের কারণে লুঠ করার উদ্দেশ্য ছিল তবে আশেপাশের অঞ্চল ("neighbouring localities") গুলিও রেহাই পেল না কেন? লুঠেরাদের জাত-ধর্ম থাকে কী? তৈমুরলঙতো হিন্দুস্থানের পৌত্তলিকতা ধ্বংস করতে এসে ১৩৯৮-এর সেপ্টেম্বরে সিন্ধুনদী পেরিয়ে প্রথম যে ছোট্ট দ্বীপের রাজ্যটি ধ্বংস করেন তার রাজা ছিলেন একজন মুসলমান—শিয়াবুদ্দীন মুবারক। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত "দি মুস্লিমস অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" বইয়ের লেখক পিটার হার্ডি পণ্ডিতি ঢঙে আধুনিক কায়দায় বহু রেভিনিউ রেকর্ড ঘাঁটা-ঘাঁটি করে শেষ পর্যন্ত মহাবিদ্রোহের মধ্যে মুসলমান চরিত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বিশেষ করে অযোধ্যা এবং গ্রামাঞ্চল ("Muslim Character of the rising in Oudh and Countryside")। অবশ্য তারপরই তিনি বিহার, মধ্য ভারতের সাথে অযোধ্যাতেও যে হিন্দুদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল সে কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ("The civil risings in Awadh, Bihar and Central India were mostly Hindu led") আশ্চর্য লাগে পিটার হার্ডি আলীগড়ে বিদ্রোহীদের মুখে দীন! দীন! শুনে পুলকিত হয়েছেন (হার্ডি পৃঃ ৬৪-৬৬) কিন্তু তাঁর চোখে পড়েনি কানপুরে ৯ই জুন মহাবীরের ঝাণ্ডা ও সবুজ পতাকা - বিদ্রোহের প্রতীক হিশেবে

বিদ্রোহীদের হাতে সগর্বে শোভা পাচ্ছিল। (গুপ্ত, পৃ: ৮১) পিটার হার্ডি যখন ১৯৭২ সালে মহাবিদ্রোহে সাধারণ ভাবে মুসলমান ষড়যন্ত্রের ("The case for a general Muslim conspiracy") তত্ত্বকে জোরদার করার অনুকূলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যাচ্ছেন তখন তাঁরই এক "পূর্বপুরুষ" জি. ও. ট্রেভেলিয়ান মহাবিদ্রোহের সমকালীন ১৮৬৫ সালে এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি তাঁর "কানপুর" বইতে বলেছেন, মুসলমান জনসাধারণের উপর ষড়যন্ত্রের দোষারোপ করা যেন "এক ফ্যাশানে" দাঁড়িয়ে গেছে। (পৃ: ৮৯) এলাহাবাদ জেলায় যদি চেল পরগনার মুসলমানরা বিদ্রোহ করে থাকে তবে ওই জেলার "প্রাগওয়াল" ব্রাহ্মণরাও এগিয়ে এসে হিন্দু জনসাধারণকে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকবে। (মজুমদার, পৃ: ৪৯৭)। ১৮৫৭-র সেপ্টেম্বরে সাঁতারায় ফাঁসীর মঞ্চ থেকে জনতারপ্রতি এক হিন্দু আহ্বান জানালেন, "যদি তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সন্তান হন—তবে তাঁরা বিদ্রোহ করবেন।" (সেন, পৃ: ১০৯, ফুটনোট) সবশেষে মুসলমানরা কত মন্দির লুঠ করেছিল আর হিন্দুরা কত মুসলমানকে হত্যা করেছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে সে তথ্যের সন্ধানে যখন ইংরেজ ও কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক তাঁদের প্রায় জীবনদান পরিশ্রম করেছেন তখন কিন্তু এ দৃশ্য বোধহয় সবার চোখে এড়িয়ে গেছে যে ইংরেজরা এই মহাবিদ্রোহে মন্দির এবং ইমামবাড়া ভাঙায় এক রেকর্ড সৃষ্টি করে গেছে। (সেন, পৃ: ৩৫২) ঝাঁন্সী লুঠের অন্যতম নায়ক ইংরেজ অফিসার সিলভেষ্টার পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় সগর্বে স্বীকার করেছেন কিভাবে তিনি স্বর্ণ অলঙ্কার মণ্ডিত বিভিন্ন দেব-দেবী লুণ্ঠন করেছিলেন। (সেন, পৃ: ২৮৮, ফুটনোট) মৌলানা আজাদ ১৮৫৭র নেতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনের জন্য কোনো সচেতন প্রয়াসের নজির খুঁজে পাননি। (সেন, পৃ: XVII) অথচ ১১ই মে' দিল্লী দখলের পরই বিদ্রোহীদের তরফে যে ঘোষণাপত্র জারী করা হয়েছিল তা' শুরু হয়েছিল "হিন্দুস্তানের হিন্দু এবং মুসলমান নাগরিক ও কর্মচারীদের" অভিনন্দন জানিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের গুরুত্বের উপরও খুব জোর দেয়া হল… "It is further necessary that all Hindoos and Mussulmans unite in this struggle" (সিপয় মিউটিনি, পৃ: ৪০১-৪০২) বলা হল শৃঙ্খলা ও "দরিদ্র শ্রেণীকে সন্তুষ্ট" এবং "নিজেদের মর্যাদারক্ষার" খাতিরেই এই ঐক্যের প্রয়োজন আছে। আজমগড় ঘোষণাপত্রেও হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত ও

মৌলভীদের মহাবিদ্রোহে যোগদানের সুস্পষ্ট আহ্বান জানানো হয়েছিল। (সেন, পৃঃ ৩২) বেরিলীর বিদ্রোহী নবাব নাজিম খান বাহাদুর খাঁ শাসনকার্য চালানোর জন্য দু'জন হিন্দু এবং ছ'জন মুসলমানকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করেন। তিনি নিজের সমর্থনে মুসলমান ধর্মগুরুর "ফতোয়া" লাভের সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে "ব্যবস্থা" লাভেরও চেষ্টা করেন। (সেন, পৃঃ ৩৪৯ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীতে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদেরই মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব ছিল। নেতৃত্বেও তাই। "নানার ছিল আজিমুল্লা খাঁ, বাহাদুর খাঁর শোভারাম আর ঝাঁন্সীর রানীর আফগান রক্ষীরা" (পৃঃ ৪০৬) হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্য যে শুধু এক কথার কথা ছিল না তার প্রমান ক্যাপ্টেন গোওয়ান হিন্দু প্রতিবিপ্লবের জন্য গোপনে বেরিলীর ঠাকুর সম্প্রদায়কে ৫০,০০০ হাজার টাকা দেয়ার প্রস্তাব করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হন। (সেন, পৃঃ ৩৫২) তাই ঐতিহাসিক কেই নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, "মুসলমান ও হিন্দুরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল।" (কেই, ১ম, পৃঃ ৫৬৫) বিদ্রোহীদের আবেদন সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে এমন ভাবে অনুপ্রানিত করেছিল যে মৃত্যুকেও তারা পরম তাচ্ছিল্যের সাথে গ্রহণ করেছিন। সমসাময়িক ইংরাজ কর্মচারী শেরার লিখছেন, মৃত্যুপথযাত্রী মুসলমানদের মধ্যে যখন দারুন ঘৃণা দেখা গেছে তখন আশ্চর্যজনক ভাবে হিন্দুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে চরম ঔদাসিন্য। (সেন, পৃঃ ১৬১) মহাবিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহীদের তরফে যে সব ঘোষণাপত্র আজপর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এসেছে তার কোনো একটিতেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও পরোক্ষ-ভাবে এই স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। (সিপয় মিউটিনি, পৃঃ ৪৩০-৪৩১, ৪নং ফুটনোট) তিনি বহুকষ্টে অযোধ্যার ওয়ালী বিরজিস কাদেরের এক ঘোষণাপত্র পরীক্ষা করে অভিমত দিয়েছেন যে এটি কেবল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছিল—অবশ্য তাতে হিন্দু-বিদ্বেষী কোনো শব্দ তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি (ঐ, ২৪নং ফুটনোট)। তবে সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন বিরজিস কাদেরের ঘোষণাপত্রগুলি হিন্দু-মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সজাগ করে দিয়েছিল। (ঘোষণাপত্রের অনুবাদ, সেন, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪ এবং ৩১) যে অযোধ্যার ওয়ালী সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিযোগ সেই অযোধ্যার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেই "সিপয় মিউটিনি" গ্রন্থে বলছেন

"সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বেশ বুঝে-সুজে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল।" (পৃঃ ১৩১) ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে স্পীয়ারের বক্তব্য: "পরিস্থিতির গভীরে বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় পশ্চিমের আগমনের বিরুদ্ধে চিরাচরিত ভারতের শেষ সাড়া জাগানো প্রতিবাদ হিশেবে।" (স্পীয়ার, পৃঃ ১৪৩) তাঁর মতে বিদ্রোহ ছিল পশ্চাদমুখী। এমন কোনো প্রগতিশীল কার্যক্রম পাওয়া যাবে না যা' ঐক্যবদ্ধ ভারতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ডতা দেখে কার্ল মার্কস অভিভূত হয়ে গেছলেন। ১৮৫৭ সালের ৩১শে জুলাই লিখিত প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্ট করে জানান যে, যেসব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা একে "সামরিক বিদ্রোহ বলে ভাবছে তা' আসলে একটা জাতীয় বিদ্রোহ।" (মার্কস, পৃঃ ৫৭) সৈন্য-বাহিনীর বিদ্রোহে যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী জড়িত সে বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় "বোম্বাই ও মাদ্রাজ আর্মির অধিকাংশই যদিও নীচু জাতের লোক দিয়ে গঠিত তাহলেও তাদের প্রতি রেজিমেণ্টেই শ' খানেক করে রাজপুত মেশানো আছে। বেঙ্গল আর্মির উচ্চ বর্ণের বিদ্রোহীদের সঙ্গে আকর্যক সংযোগ স্থাপনের পক্ষে সংখ্যাটা যথেষ্ট।" (মার্কস, পৃঃ ৫৮)

আন্দোলনের পশ্চাদমুখীনতা প্রমান করাব জন্য স্পীয়ার বলেছেন যে সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী ইংরাজদের পক্ষে ছিল। (স্পীয়ার, পৃঃ ১৪৩) বিপানচন্দ্র এর একটা জবাব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ওই সব শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভুল করে বিশ্বাস করেছিল যে ব্রিটিশ শাসন তাদের সাহায্য করবে দেশকে আধুনিকী করণে আর অন্যদিকে বিদ্রোহীরা নিয়ে যাবে দেশকে পেছনের দিকে। "একমাত্র পরবর্তী কালে শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে ছিল যে বৈদেশিক শাসন দেশকে আধুনিকী করণে সাহায্য করে না বরং পরিবর্তে তাকে আরো নিঃস্ব ও পশ্চাতে নিয়ে যাবে।" (বিপান, ১৪৭-১৪৮) বিপানচন্দ্রের মতে "১৮৫৭ সালের বিপ্লবীরা বরং দূরদর্শী ছিলেন বলে নিজেদের প্রমাণ কররেছেন। বৈদেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি অনেক ভাল ছিল এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছিলেন।" (ঐ, পৃ. ১৪৮) কিন্তু বিপ্লবী আখ্যা দিলেও বিপানচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা করেছেন বিদ্রোহীদের সামন্ত তান্ত্রিক রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ("going back to feudal monarchy")

অর্থাৎ ঘুরিয়ে স্পীয়ারের সেই "চিরাচরিত ভারতে" "traditional India")'র বক্তব্যকেই স্বীকার করা।

মার্কস বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বলেছেন যে পরিবর্তনশীল জগতে বস্তু কখনোই তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে না—সুতরাং এতবড় মহাবিদ্রোহের পরও আবার সেই "চিরাচরিত ভারত" বা "সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র" ফিরে আসবে একথা যাঁরা বলেন তাঁরা যে ইতিহাসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার দোষে দুষ্ট একথা বলা বাহুল্য। তবু যদি ধরে নেয়া যায় বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র ছিল তাহলেও বা তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কৃতিত্ব কি ভাবে খর্ব হতে পারে? হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন বেশ সঠিক ভাবেই :—"১৮৪৮ সনের হাঙ্গেরি জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা তীর্থস্থান বিশেষ কিন্তু সেখানে "ফিউডাল" ব্যাপারের ছড়াছড়ি কি সেদিন পর্যন্ত ছিল না? মাৎসিনি প্রমুখ যাঁরা জাতীয়মন্ত্রের উদ্গাতা কীর্তিত, তাঁদের ইতালিতে "ফিউডাল" ধারার কি অভাব ছিল?" (ভূমিকা, সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৮-১৫)

মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৮৫৭র ভারতের পরিস্থিতি প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক ছিল, তাই সাধারণ ভাবে আন্দোলনের চেহারাও ছিল কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক। তবু যেহেতু অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈদেশিক আধিপত্য ও অত্যাচারের অবসান—যে কারণে জনগণ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সেহেতু কেবল মাত্র সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলে কিছুতেই দেগে দেয়া যাবে না। (NEUE INDIEN KUNDE, NEW INDOLOGY ; Berlin, 1970 ; পৃঃ ১১০ ; NO. 72)

প্রকৃত পক্ষে সামন্ততন্ত্র ও ধর্ম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে কখনোই নির্মূল হয় না। শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের পরও দীর্ঘকাল ধরে চলে এই দু'টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তো একটি কথাই সৃষ্টি হয়েছে—"দেশপ্রেমিক ভূস্বামী" ("patriotic landlord") আর এটাও সুবিদিত যে মাও-সেতুঙের বিপ্লবের দিনগুলিতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূরা একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (এপ্রিল-মে, ১৯১৯) আমির আমানুল্লা ও তাঁর সঙ্গীরা আফগানিস্তানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করে ছিলেন তার সম্পর্কে

স্তালিন মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "রাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তিনি (আমানুল্লা) আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই চালাচ্ছেন বাস্তব অবস্থা বিচারে সেটা বিপ্লবী লড়াই। কারণ তাতে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হচ্ছে, ভেঙে পড়ছে আর ভিত নড়ে উঠেছে।" (জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ৫৭) মহাবিদ্রোহের সম্ভাব্য সাফল্য শুধু ব্রিটিশ নয় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকেও যে কি পরিমাণ দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছিল তার প্রমাণ তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরাজদের সাহায্য প্রদান। পোপের উৎকণ্ঠা আর "ওয়াশিংটন ইউনিয়ন" তো সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের মনের কথাই বলে ফেলল, "একমাত্র আমেরিকার ক্রীতদাস-মালিকরা ছাড়া সমগ্র খৃষ্টীয় জগত একই সাথে বিপদে পড়বে।" (কোলিয়ার, পৃঃ ১৫৩) বিদ্রোহ চলাকালীন ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ স্বর্ণ ভাণ্ডারেও টান পড়েছিল। স্বর্ণমোহর তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছল। অর্থাৎ এক পাউণ্ড বারো শিলিঙের জায়গায় ১ পাউণ্ড আট শিলিঙে দাঁড়িয়ে ছিল। (ঐ, পৃঃ ২০৮) লড়াইতে প্রতি মাসে ইংলণ্ডের খরচ পড়ছিল দশ হাজার পাউণ্ড করে। কর্মহীন সিভিল অফিসারদের ভাতা বন্ধ হয়ে গেছল। দোকানদাররা চেকের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল—সবাই দাবী করছিল নগদ অর্থ।

যাঁরা মহাবিদ্রোহে ধর্মের প্রতি আহ্বান দেখে শিউরে ওঠেন, চিন্তা করেন বুঝি বা মধ্যযুগে আবার ফিরে যেতে হবে, তাঁরা কি বলে ব্যখ্যা দেবেন ফ্রান্সে বিশ্বের প্রথম গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পরও মাত্র বারো বছরের মধ্যে ১৮০১ সালে নেপোলিয়ানকে পোপের সাথে শান্তি চুক্তি করতে হল দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ রোম্যান ক্যাথলিকদের খুশী করার জন্য? পোপের বিরুদ্ধে জার্মান "কুলটূর কাম্ফে"র উদ্যোক্তা বিসমার্ককে আট বছর লড়াই করার পর শেষ পর্যন্ত সেই ১৮৭৮ সালে পোপ ত্রয়োদশ লিওর সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়েছিল। অথচ মনে রাখা দরকার ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে আপোষ সত্ত্বেও এই দেশ দু'টি মধ্যযুগে ফিরে যায় নি। যদিও আবার জার্মানীতে একটি রাজতন্ত্র ছিল হোয়েনজোলার্ণ।

এটা ঠিকই মহাবিদ্রোহে সামন্ত প্রভুরা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সামন্ত শোষণের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত সেই মহাজন, বানিয়াশ্রেণী কিন্তু মহাবিদ্রোহের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধীতাই করেছে। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত সাধারণ

মানুষের আক্রোশের লক্ষ্য হয়েছে তারা। দিল্লীতে সরকার থেকে যদি মহাজন গিরবার সিংহ ও গিবিধারীলালকে দু'লাখ টাকারও বেশি অর্থ দিতে বাধ্য কবা হয়ে থাকে তাহলে বাদাউনে জনসাধারণ নিজের থেকে এগিয়ে মহাজনদের আত্মসাৎ করা অর্থ লুণ্ঠন করেছে। (সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৩৫; মজুমদার, পৃঃ ৫২৩) আবার বিদ্রোহ প্লাবিত অংশে রাজন্যবর্গ, জমিদার এবং তালুকদারেব এক বিরাট সংখ্যক বিদ্রোহকে সমর্থন তো করেই নি উপবন্ধ সক্রিয় ভাবে বাধা দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখছেন বাহাদুর শাহ উত্তর ভারতের বহু রাজন্যবর্গ এবং পাতিয়ালার মহারাজকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে হতাশ হয়েছিলেন। (সেন, পৃঃ ৪০৫) প্রকৃত পক্ষে সমগ্র রাজন্যবর্গেব মাত্র এক শতাংশের বেশি এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। ১৮৫৮ সালেব মে' মাসে ক্যানিংএব ঘোষণাপত্র জারী হল। বলা হল মাত্র ছ'জন ছাড়া আব বাকি সব তালুকদারেব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। হোমস বলছেন মানসিংহসহ মাত্র আটজন তালুকদার ছাড়া আব কোনো তালুকদার অযোধ্যাতে ক্যানিং এব ঘোষণাব পরে বিদ্রোহ করে নি। (ফ্রিডম. মুভ, পৃঃ ১১১) অর্থাৎ বিদ্রোহেব প্রায় একবছব পরে এই সব ভূস্বামীরা ইংরেজের বিরোধিতা করেছিল। শুধু অযোধ্যা নয় অন্যত্রও ভূস্বামীদের মহাবিদ্রোহে ভূমিকা দ্বিধাগ্রস্ত এবং কোথাও বিরোধীতা। যেমন, বাদায়ুনের হরদেও বখশ, বিজনোরের তিন হিন্দু জমিদাব. বিহারের জুমেরাব চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি। (সেন, পৃঃ ২৬৪) বাংলা-দেশের বৃহৎ ভূস্বামীদের কথা তো বাদই দিলাম। (মজুমদার, পৃঃ ৫৩৫)

একটা কথা মনে রাখা দরকার, বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা সম্রাট হিশেবে স্বীকাব করলেও তাঁর সক্রিয় ক্ষমতা তারা হরণ করেছিল। কান-পুরের নানা সাহেব, বেরিলীর খাঁন বাহাদুর খাঁ এবং রানী লক্ষ্মীবাঈ—এঁরা সবাই বিদ্রোহেব প্রাথমিক স্তরে অনুপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহীদের কাছে এঁদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য ছিল বলেই তারা মেনে নিয়েছিল, কোনো বাধ্য বাধ্যকতা ছিল না। আরো একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য—তা' হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া এঁদের কোনো নিজস্ব রেজিমেণ্টও ছিল না। সুতরাং এটাও বলা যায় যে বিদ্রোহী সিপাহীদের রাজন্যবর্গের প্রতি চিরকাল আনুগত্য থাকবে এ নিশ্চয়তা কোথায় স্মরণ করা যেতে পারে ১৮৪৮ সালে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের উপহার দেয়া রাজমুকুট ফ্রেডারিখ চতুর্থ উইলিয়াম

গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। প্রাশিয়ার রাজা জানতেন অষ্ট্রিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে যে মুকুট তাঁর কাছে এসেছে তার সাথে জড়িয়ে আছে জার্মান জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই সভয়ে ফ্রেডারিখ সরে দাঁড়ালেন। অজ্ঞ জনতার হাত থেকে তিনি কিছুতেই রাজমুকুট নিতে পারেন না—"can not pick up a crown from the gutter"! আর বাহাদুর শাহ ক সেই রাজমুকুট পরতে হয়েছিল।

এটা ঠিক নয় যে বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের সবাই কিছু রাজা-রাজড়া বা সামন্ত শ্রেণী থেকে এসেছিল বা বিরাট কিছু ধনী ছিল। জেনারেল বখত খাঁ ছিলেন ইংরাজ কোম্পানীর এক সাধারণ সুবাদার—তা'ও চল্লিশ বছর চাকুরীর পর। নানার প্রধান সহকারী আজিমুল্লা ছিলেন এক ফরাসী জানা শিক্ষক, রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ ওরফে তাঁতীয়া টোপী ছিলেন নিতান্ত ব্যক্তিগত সেবক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী নানার অপর এক বিশ্বস্ত অনুচর মুদ্দুদ আলী ছিলেন ঘোড়ার ব্যবসায়ী। (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ৮৩) ফৈজাবাদের মৌলভী আহমেতুল্লা ছিলেন ধর্ম প্রচারক প্রধানতঃ আর পাটনার পীর আলী ছিলেন ওয়াহাবী সমর্থক পুস্তক বিক্রেতা। কানপুরের ভাওদাজির পরিচিতি ছিল পণ্ডিত বলে। মহারাষ্ট্রের সাতারায় বিদ্রোহের আহ্বান কোনো মারাঠা ভূস্বামী জানায় নি, জানিয়ে ছিলেন এক সাধারণ হিন্দুস্থানী চাপরাশী। (সেন, পৃঃ ৪০৯) অখ্যাত এক নাজির ১২ই জন বিহারের শিখ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে গিয়ে ফাঁসীতে প্রাণ হারালো। (সেন, পৃঃ ২৪৬) মনে রাখা দরকার খাঁন বা লক্ষীবাঈ নন, এই সমস্ত জানা-অজানা ব্যক্তিরাই যাঁরা এসেছিলেন সমাজের "থার্ড এষ্টেট" থেকে বা কায়েমী স্বার্থের বাহিরে তাঁরাই প্রস্তুত করেছিলেন বিদ্রোহের জমি। ট্রেভেলিয়ান বলছেন, ভ্রাম্যমাণ ফকীর ও সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্রোহের প্রাক্কালে বিভিন্ন দেশীয় বাহিনীর ছাউনীতে এদের গোপনে দেখা যেত। বিদ্রোহের পর দিল্লীতে যে "কোর্ট" গঠিত হয়েছিল তাতে তিন জন মৌলভী ছিলেন। লক্ষ্যণীয়, কানপুরের এক স্কুল শিক্ষকের প্রেস থেকে নানাসাহেবকে সমর্থনের জন্য ঘোষণা পত্র ছাপা হয়েছিল দু'রকম ভাষায়। যে ৫৬নং রেজিমেণ্ট কানপুরে বিদ্রোহ করেছিল তার নেতৃত্বে দিয়ে ছিল কোনো সুবাদার নয় খাঁন মাহমুদ নামে সামান্য এক সিপাহী। (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ৬৫ এবং ১১৪)

এ ছাড়াও ছিল লর্ড রবার্টস কথিত "নতুন এক প্রজন্ম," যারা ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারে নি।

মহাবিদ্রোহের সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে এক আতঙ্কের চিত্র ইউরোপীয় এবং এক শ্রেণীর ভারতীয় ইতিহাসবিদরা তুলে ধরেন। যার অর্থ এর সাফল্য ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে রেখে মধ্যযুগের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করত। পলাশীর যুদ্ধের পর যে জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটেছিল, তা অকালে বিনিষ্ট হোত। যদুনাথ এ কারণেই "পলাশী"র প্রশংসা করেন।

সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল বলে যাঁরা মনে করেন সাফল্যের পরও সমাজ ও শাসনে সামন্ততন্ত্রের পুনরায় অভিষেক ঘটবে তাঁরা পরস্পর বিরোধী সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘর্ষে বিশ্বাসী নন, কাল্পনিক মিলনের সমাধানে আস্থাবান।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ গড়ে উঠেছিল ব্রিটেনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়াদের স্বার্থে। কলকাতা এবং বোম্বেতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠেছিল। কলকাতায় বাঙ্গালী এবং বোম্বেতে পার্শীরা কোম্পানীর সাথে সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮২০র শেষে ব্রিটিশরা বিহারে ইক্ষুচাষ, বেরারে উন্নত ধরণের কার্পাস চাষ এবং বাংলায় সিলকের জন্য ইতালী থেকে গুটি পোকা আমদানী করছিল। অন্যদিকে ভারতের বিকাশশীল ব্যবসার সাথে বিশ্ব বাজারের যোগাযোগ ঘটায় গড়ে উঠেছিল বন্দর শহর—আর ওই বন্দরগুলির বাণিজ্যিক ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথেও ঘটছিল। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ভারতে প্রথম ছোট ছোট কারখানাও তৈরী হল। খোদ ভারতে, প্রধানতঃ বোম্বে এবং কলকাতায় সৃষ্টি হল নতুন ব্যবসায়ী পরিবার—ভারতীয় কম্প্রাডোর বুর্জোয়া। এরা পাল্লা দিয়ে ইউরোপীয়দের সাথে নিজেরাই ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লগ্নী করত।

উনিশ শতকের তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়াদের আবির্ভাব একটি গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। যদিও বিস্তর বাধার জন্য গতি ছিল মন্থর। অন্য দিকে পণ্য-মুদ্রার সম্পর্কের বিকাশ সর্বত্র সমান না হলেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (একশো বছর ব্রিটিশ শাসনে থাকার ফলে) এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই সম্পর্ক দ্রুত অনুভূত হচ্ছিল। লক্ষ্যণীয়, গ্রাম্যগোষ্ঠীগুলি যেমন ভেঙে পড়ছিল তেমনি আবার জমিতে

ব্যক্তিগত মালিকানা আরো শক্ত হয়ে গেড়ে বসায় চাষীরা ক্রমশঃ আপন জমিতে বর্গদার বা আরো নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হচ্ছিল। বেনিয়া, মহাজন— যারা সুদের কারবারি করে তারা কৃষকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে দিনের কর্মধারা বিস্তৃত করছিল, বিশেষ করে পাঞ্জাব, পশ্চিম ও মধ্যভারতে। এক উত্তর পশ্চিম প্রদেশেই ১৮৪০র মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ একর জমি অকৃষকদের হাতে চলে যায়। এইসব জমির মালিক হয়েছিল ব্যবসায়ী, মহাজন এবং ভূস্বামীরা। আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা দেখি লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষকে মহাবিদ্রোহে যোগ দিতে। ব্রিটিশরা এটা বুঝেছিল বলেই মহাবিদ্রোহের পর সীমিতভাবে হলেও সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কিছু ভূমি সংস্কার করে।

মুদ্রা-পুঁজি ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে আসায় গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর দেখা দিল। এবং এই শ্রেণীর লোকেরা এখন নতুন জমির মালিকে পরিণত হল। আবার অন্যদিকে জাতীয় শিল্প গড়ে ওঠার পূর্ব শর্তেরও সম্ভাবনা দেখা দিল।

সুতরাং মহাবিদ্রোহে যদি ইংরাজদের পরাজয়ও ঘটত তাহলেও কি ভারতের এই সম্ভাবনাপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেত? হাজার হাজার কৃষকরা তহশীলদারের অফিসে আগুন দিয়ে মহাজনের বন্ধকী কাগজ ছিঁড়ে ফেলে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তা' কি তারা "সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যে"র কাছে বলি দিতে রাজী হত? ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ সামন্ততন্ত্রের প্রবক্তা অষ্ট্রিয়ার মেটারনিক ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শগুলোকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তোড়ে সেই মেটারনিককে অষ্ট্রিয়া থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হল। ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সে বৃহৎ ভূস্বামী এবং কর্পোরেশন (মূলতঃ চার্চের) গুলির ভূসম্পত্তির ব্যাপক হাত বদল ঘটেছিল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুর্বোরাজারা পুরানো ভূস্বামীদের তার সামন্যই ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল। ডেভিড থমসনের মতে জনসাধারণের এক সুবিশাল অংশকে অসন্তুষ্ট রেখে রাজার পক্ষে তা' আর করা সম্ভব ছিল না। (পৃঃ ১০৬) এটা আশাই করা যায় না কোম্পানীর আমলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় যে কৃষকরা সরাসরি জমির বন্দোবস্ত পেল তারা সেই মালিকানার অধিকার বিসর্জন দিয়ে আবার পুরানো ভূমি ব্যবস্থায় ফিরে যেতে রাজী হবে। যদি ধরে নেয়া যায়

দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বৃহৎ ভূস্বামীরা কৃষকদের তাঁবে আনার জন্য নতুন করে লড়াই চাপিয়ে দেবে তাহলে দেখা যাবে সে লড়াইতে কৃষকরা একা লড়ছে না। লড়ছে এক নতুন গড়ে ওঠা মোর্চা—যার শরিকরা যোগ দেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। আজমগড় ঘোষণাপত্র লক্ষ্য করলেই এই মোর্চার সম্ভাব্য শরিকদের শ্রেণীগত অবস্থান খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন, ব্যবসায়ী, কারিগর, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী এবং নিম্ন বেতন ভুখ সিপাহীবৃন্দ। মহাবিদ্রোহের সাফল্যের ফলে সাধারণ মানুষের যে বাঁধ-ভাঙ্গা তরঙ্গ দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের দু'কূল প্লাবিত করে নিয়ে যেত, তাকে আটকাবার সাধ্য ছিল না কেবল পুরানো সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের নজির দেখিয়ে। সুবাদার টিকা সিংহ কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের তরফে নানাকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে খবর দিচ্ছেন, আমরা ধর্মের কারণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই একতা যদি ধর্মের ব্যাপারে সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটি আরো দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল যখন দেখি ট্রেভেলিয়ান বলছেন, "মহাবিদ্রোহে যোগ দিল তারাই যারা দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত আর অসন্তুষ্ট।" (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ১১৩ এবং ৭৩) অসন্তুষ্ট শুধু সামন্ত প্রভুরাই নয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ; কেউ তলোয়ার শাণ দেয়, কেউ তুলোর ধুনুরি আর কেউ রূপোর গহনার ব্যাপারী। (ঐ, পৃঃ ১০০) অযোধ্যা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন, সাধারণ মানুষ আর সামান্য সিপাহীদের মধ্যে কোনো প্রভেদ রেখা টানা সম্ভব ছিল না। মহাবিদ্রোহ যে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংঘর্ষে পরিণত হত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেমনটি ঘটেছিল ১৭৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে ফ্রান্সে মূলশত্রু ষোড়শ লুইকে গিলেটিনে চড়াবার পর জাকব্যাঁ এবং জিরঁন্ডাদের মধ্যে।

পিটার হার্ডি মহাবিদ্রোহের পেছনে মুসলমানদের হাত দেখলেও ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। যুক্তি হিশেবে দেখিয়েছেন বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহের সাথে সাথে কয়েক শ' মাইল ব্যবধানে রোহিলখণ্ডের গ্রামাঞ্চলেও অভ্যুত্থান ঘটে গেল। রমেশচন্দ্র মজুমদার মুসলমানদের হাত না দেখলেও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন নীচুতলার সিপাহীদের মধ্যে। তাঁর মতে সিপাহীরাই ষড়যন্ত্র করেছিল, তবে ফৈজাবাদের মৌলভীর মত কিছু বাইরের শক্তি প্ররোচনা দিয়ে থাকতে পারে। (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ২০৯-২১০; হার্ডি

পৃঃ ৬৫) মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁর মতে এই বিদ্রোহ ছিল হিন্দুদের আর মুসলমানরা তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে লেখা "দি আফটারমাথ অব বিভোল্ট ; ইণ্ডিয়া ১৮৭০" বইয়ের লেখক টমাস। আর মেটক্যাফ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন এব' ব্রিটিশের চোখে এটি ছিল মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। (হার্ডি, পৃঃ ৬২) সুরেন্দ্রনাথ সেন যদিও মহাবিদ্রোহের পেছনে ওয়াহাবীদের ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি, এমনকি একথাও বলতে পারেননি যে ডুমরাঁওরাজা এবং টিকারীর রানী ষড়যন্ত্রে সত্যসত্যই জড়িত ছিলেন না (সেন, পৃঃ ২৪৫-২৪৭) তথাপি তিনি নিশ্চিত যে ১৮৫৭র পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র ছিল না। (সেন, পৃঃ ৪০৫) পাঞ্জাবের তৎকালীন চিফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স বহু বেআইনী চিঠিপত্তর কব্জা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ওইসব চিঠিতে ষড়যন্ত্রের কোনো সঙ্কেত ছিল না তাই তাঁর ধারনা কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না। তাঁর মতে সেরকম কিছু থাকলে অন্ততঃ ফাঁসীর দড়ি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সিপাহীরা তা' ফাঁস করে দিত। "আদতে তারা কিছুই জানত না।" (ফ্রিডম, মু ৬, পৃঃ ২০০) লরেন্সের যুক্তি খুব সহজ। যেহেতু তারা ফাঁস করেনি বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাই তাদের তরফে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না। অথচ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন নীচুতলার সিপাহীরা এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল। মহাবিদ্রোহের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা "কানপুর" বইয়ের লেখক ট্রেভেলিয়ান ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রে হিন্দুদের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত। ট্রেভেলিয়ান ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের নাম না বললেও এটা জানিয়েছেন যে প্রধানতঃ হিন্দুরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে চর্বি মেশানো কার্ট্রিজ সমেত নানা গুজব রটাতো। এর মধ্যে থাকতো চাপাটি বিলির কাহিনী, ফাঁসীর দড়ি, মাঝরাতে আগুন প্রভৃতি। তিনি বিশেষ করে ১৯নং রেজিমেণ্ট থেকে বিতাড়িত ব্রাহ্মণ সিপাহীদের কথা উল্লেখ করেছেন। (পৃঃ ৬১) মহাবিদ্রোহের অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী রবার্টসও ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে বলেন যে তৎকালীন অসন্তোষপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছিল। রবার্টস, পৃঃ ১৫) তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নানাসাহেব ও তাঁর সহকারী আজিমুল্লা খাঁর উল্লেখ করেছেন। আজিমুল্লা পেশোয়ার উত্তরাধিকারী হিশেবে নানাসাহেবের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য লণ্ডনে গেছলেন এবং সে সময়ে

ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। লাফোঁ নামে এক ধনী প্রভাবশালী ফরাসী ব্যবসায়ীর সাথে গোপনপত্র বিনিময়ও করেন। উদ্দেশ্য কলকাতায় বিদ্রোহ ঘটলে চন্দননগরের ফরাসীরা যেন সাহায্য করে। আজিমুল্লার লেখা আরো যে চিঠিগুলি ইংরাজরা হস্তগত করে তার থেকে অন্ততঃ দুটি লেখা হয়েছিল কনষ্ট্যাণ্টিনোপলের ওমর পাশার কাছে। বিষয়বস্তু ছিল সিপাহীদের অসন্তোষ ও ভারতের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি। যদিও শেষ পর্যন্ত চিঠিগুলো পাঠানো সম্ভব হয়নি। রবার্টসের মতে দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যার নবাব এবং বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নানার ষড়যন্ত্রের সাথে যোগ ছিল। (ঐ, পৃঃ ৪২৯) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে এক দেশীয় সাংবাদিক সতর্ক করে দেন যে দিল্লীর সম্রাট গোপনে পারস্যের শাহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। পারস্যের সৈন্য আসছে বলে জুম্মা মসজিদের গায়ে প্রচারপত্র সাঁটা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সুরেন্দ্রনাথ সেন এ তথ্য স্বীকার করেন। (পৃঃ ৪০৩) পারস্যের তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মুরে ক্যানিংকে জানিয়েছিলেন যে উত্তর ভারতের মুসলমান প্রধানদের পারস্যের তরফে আহ্বান জানানো হয়েছিল মহাবিদ্রোহে যোগ দিতে। (সেন, পৃঃ ৪০৪-৪০৫) ক্র্যাক্রোফট উইলসন যিনি মোরাদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মহাবিদ্রোহের সময়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন : "ঘটনার সঙ্গে মৌখিক সংবাদকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে ১৮৫৭র ৩১শে মে রবিবার নির্দিষ্ট হয়েছিল বেঙ্গল আর্মির সর্বত্র বিদ্রোহের জন্য। প্রতিটি রেজিমেণ্টে বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য তিনজনকে নিয়ে কমিটি হয়েছিল। সাধারণভাবে অন্য সিপাহীরা কিছু জানত না।...এই কমিটি চিঠিপত্রের যোগাযোগ এবং বিদ্রোহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা করত।" (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ১০৭) সমসাময়িক স্যার সৈয়দ আহমেদ সিপাহীদের মধ্যে চিঠিপত্রের যোগাযোগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেও সুরেন্দ্রনাথ সেন ইউলসনের সিদ্ধান্তকে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকার অভিযোগে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। (সৈয়দ আহমদ; সেন, পৃঃ ৪০৩ এবং ৪০৪) বিপানচন্দ্র বলেছেন মহাবিদ্রোহের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে বিদ্রোহীরা কোনো প্রমাণ রেখে যাননি। তাঁর ধারণা বেআইনী কাজ-কর্মের জন্যই তাঁরা কোনো রেকর্ড রেখে যাননি। তা' ছাড়া পরাস্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের পক্ষের সমস্ত প্রমাণ লোপ পেয়েছে। (বিপানচন্দ্র, পৃঃ ১৪০) তবে মনে রাখা দরকার উইলসন একজন প্রত্যক্ষদর্শী উচ্চপদস্থ

রাজ-কর্মচারী ছিলেন।

বোধহয় একমাত্র সুবেন্দ্রনাথ সেন ছাড়া আর সব খ্যাতনামা ইতিহাস-বিদরা—ইউরোপীয় ও ভারতীয়, সবাই ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমত। তবে কুঁওর সিংকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। কুঁওর সিংএর জেলা শাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েকের পাটনার কমিশনারকে লেখা (১২ই জানুয়ারী, ১৮৪৮) চিঠির উপর ভিত্তি করে কর্ণেল মালেসন বলেছেন যে কুঁওর সিংএর বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পিত এবং তিনি সিপাহীদের সাথে পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রেখেছিলেন। নইলে কিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা দ্রুত তাঁর সঙ্গে হাত মেলালো? সুরেন্দ্রনাথ সেন এর ঠিক সদুত্তর না দিতে পেরে শেষ পর্যন্ত বলেছেন, "ওইসব অস্থিরতা পূর্ণ দিনগুলোয় প্রতিটি জমিদার যে কোনো জরুরী অবস্থার জন্য তৈরী থাকতেন।" (সেন, পৃঃ ২৫৭-২৫৮) সেই "তৈরী" থাকার মধ্যে পূর্ব থেকে কোনো পরিকল্পনা বোঝায় কিনা সে বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ নীরব।

রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কথা বলেছেন। সমসাময়িক লর্ড রবার্টস অনুরূপ উক্তি তাঁর বইতে করেছেন। মজুমদার মনে করেন সিপাহীদের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে মাত্র দু'মাসের মধ্যে বিদ্রোহ এত ব্যাপক অঞ্চলে (১০০,০০০ বর্গ মাইল, ৩৮ মিলিয়ন জন সংখ্যা) ছড়িয়ে পড়ত না। (ফ্রিডম মু৽ পৃঃ ২০৬) শুধু সিপাহীরা কেন ট্রেভেলিয়ানের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজের অন্যান্য লোক যেমন সন্ন্যাসী, ফকির এবং মাদারিরাও যোগ দিয়েছিল—তা'ছাড়া পালিশওয়ালা, ধুনুরীওয়ালা প্রভৃতি তো ছিলই। তেমনি চিঠি-পত্রও গোপন বৈঠকে অসামরিক নেতৃবৃন্দও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অংশ নিয়েছেন। যেমন কানপুরে নানাসাহেব, আজিমুল্লা, পাটনায় ওয়াহাবীরা, ফৈজাবাদে আহমেতুল্লা, আরায় কুঁওর সিং প্রভৃতি। '৮৫৬র শেষ দিকে নানা সাহেব বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া এবং লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করে গোপনে বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ সেন একথা বিশ্বাস না করলেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সন্দিগ্ধতার সাথে বলেছেন নানা যদি একাজ করে থাকেন তাহলে নিশ্চয় "খুবই কৌশল" অবলম্বন করে থাকবেন। প্রতুল গুপ্ত ষড়যন্ত্রের জন্য নানাকে দায়ী করেননি—তবে তিনি বলেছেন নানা লক্ষ্ণৌ ও মিরাটে গেছলেন। (গুপ্ত, পৃঃ ১৪ ৬৫ লক্ষ্যণীয় মিরাটেই প্রথম

বিদ্রোহ ঘটেছিল।

বিপানচন্দ্রের মতে ষড়যন্ত্র আর না—ষড়যন্ত্রের মধ্যে সত্যের অবস্থান। তিনি বলেন, "খুব সম্ভবতঃ বিদ্রোহের পেছনে একটি সংগঠিত ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল কিন্তু অকস্মাৎ ভাবে বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ায় সংগঠন পুরোপুরি এগোতে পারেনি।" (পৃঃ ১৪০) বিপানচন্দ্র অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেননি।

যেভাবে অভ্যুত্থানের গোপনীয়তা, যোগাযোগ ও উপযুক্ত সময়ের সদ্‌ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সর্বোপরি যদি প্রাথমিক সাফল্যের নিরিখে বিচার করা যায় তাহলে বলতেই হয় একটি সংগঠিত ষড়যন্ত্র বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই সক্রিয় ছিল। রবার্টসের মতে "প্রবাহিত ঝড় সম্পর্কে ব্রিটিশ অফিসারদের সামান্যতম ধারণাও ছিল না।" এই অপ্রস্তুত থাকার জন্যই মহাবিদ্রোহের সময়ে মিরাটের থার্ড ক্যাভেলরী অফিসার লেফটেন্যান্ট আলেকজাণ্ডার, শিয়ালকোটের ব্রিগেডিয়ার ব্রিণ্ড, জৌনপুরের প্যাট্রিকমারা, বেরিলীর শিব্যান্ড প্রমুখ আরো অনেকে উপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। কোলিয়ারের মতে কম করেও এধরনের মৃত ইংরেজ অফিসারদের সংখ্যা কয়েক শ' হবে, (পৃঃ ৯২)

গোপন যোগাযোগ চিঠি-পত্র ছাড়াও বৈঠকের মারফত হত। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন বাহিরের অনেকে ছদ্মবেশে সিপাহীদের শিবিরে গিয়ে বৈঠক করত। সুবাদার টিকা সিং এবং সওয়ার শামসুদ্দীন খাঁর কোয়ার্টারের গোপন বৈঠকে মাঝে মাঝেই নানাসাহেবের অনুচর জোয়ালা প্রসাদ এবং মুদ্দুত আলী উপস্থিত থাকতেন। (পৃঃ ৩৩ এবং ৭৩) সাজাহানপুরের মজাহার করিমের গৃহে বেশ কিছু হিন্দু-মুসলমানের সামনে সরফরাজ আলী বিদ্রোহের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। (মজুমদার, পৃঃ ৫০০) কানপুরে ৫ই জুন ২নং লাইট ক্যাভেলরী বিদ্রোহ করার পূর্বে মনজি ঘাটে হাবিলদার-মেজর গোপাল সিং শেখ বুলাকী, সরদার বেগ এবং রায় সিং প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করেন। (ধরম পাল, পৃঃ ১৫) পাটনাতে ও বিভিন্ন গোপন বৈঠকের সংবাদ জানা যায়—যার উপর ভিত্তি করে ষড়যন্ত্রের অপরাধে বেশ কিছু ব্যাংকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। (ট্রেভেলিয়ান, পৃঃ ৭৭) সামরিক শিবিরেও সিপাহীদের বৈঠক বসত। পাঁচ ও ছয় ফেব্রুয়ারী এ রকম দুটি বৈঠক ব্যারাকপুরে বসেছিল ৩০০ জন সিপাহীর উপস্থিতিতে। (সেনগুপ্ত,-

পৃঃ ৫৮) দেশীয় কর্মচারীদেব সাথে ও বিদ্রোহীদেব যোগাযোগ ছিল। ১৩ই মে' পেশোযাবে অনুষ্ঠিত ইংবেজ অফিসাবদেব গোপন বৈঠকেব সংবাদ টেলিগ্রাফ-প্রেবক তাঁব বিদ্রোহী বন্ধুকে জানিযে দেন। ববার্টস লিখছেন, দেশীয় কেবানীদেব বিশ্বাস কবা চলত না। (পৃঃ ৭০ এবং ৭২) পেশোয়াবে যে সমস্ত গোপন চিঠি আটক কবা হযেছিল তা' থেকে বোঝা যায় চিঠিপত্র আলংকাবিক ও সাংকেতিক ভাষায় লেখা হত। (ববার্টস, পৃঃ ৬৬) ববার্টস বলছেন, গ্যাবিসনেব প্রতিটি নেটিভ বেজিমেন্ট বিদ্রোহেব জন্য তৈবী হচ্ছিল।

চিঠিপত্র ও গোপন বৈঠক ছাডাও যোগাযোগেব সূত্র হিশেবে চাপাটি এবং পদ্ম ফুলেব কাহিনীও শোনা যায়। বেজিমেন্ট থেকে অন্য বেজিমেন্টে, চৌকিদাবেব হাত থেকে অন্য গ্রামেব চৌকিদাবেব হাতে ওগুলো বিদ্রোহেব বার্তা নিযে পৌচেছে। প্রতুল গুপ্ত পদ্মফুল দ্রুত শুকিয়ে যায় (পৃঃ ৩৪) এবং সুবেন্দ্রনাথ সেন চাপাটিকে যোগাযোগেব মাধ্যম হিশেবে অনিশ্চিত মনে কবে বাতিল কবে দিযেছেন (পৃঃ ৩ ৯) পদ্ম যদি বিদ্রোহেব প্রতীক হযে থাকে তাহলে নতুন পদ্ম নিযে বাধা কোথায় ? এই ফুল হাত বদল হযেছিল অযোধ্যা দখলেব পব। প্রতুল গুপ্ত বলছেন অযোধ্যা ফেব্রুযাবীতে দখল হযেছিল আব তখন পদ্ম ফোটেনা। কিন্তু মনে বাখা দবকার এ ঘটনা ঘটেছিল অযোধ্যা দখলেব পব—অর্থাৎ বেশ কযেক মাস পবে যখন অযোধ্যাব জনসাধাবণ তাদেব অধীনতাব জ্বালা মর্মে মর্মে বুঝতে আবম্ভ কবল তখনই তাবা বিদ্রোহেব প্রস্তুতি হিশেবে পদ্মকে প্রতীক বলে গ্রহণ কবেছিল। নিশ্চয স্বাধীনতা হাবাবাব সঙ্গে সঙ্গে নয। চাপাটিকে প্রতুল গুপ্ত একেবাবে বাতিল কবতে পাবেননি। তিনি শুধু বলেছেন, বিদ্রোহেব সঙ্গে চাপাটিব কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা প্রমাণ কবা শক্ত। ঘটনাক্রমে ট্রেভেলিযান মার্চ মাসেব গোডায় চাপাটি আব নুন দিযে হাতে গডা ময়দাব তালেব আবির্ভাবেব কথা বলেছেন। (পৃঃ ৬০) বোঝা যায় পদ্মেব আবির্ভাব তাবও পবে ঘটেছে। চাপাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কেই'ব মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। চাপাটি বিতবণে যে কোনো তাৎপর্য ছিল সে ব্যাপাবে তিনি নিশ্চিত না হলেও একটা ব্যাপাবে তিনি স্থিব বিশ্বাসী যে, যেখানে যেখানে ওই চাপাটি গেছে সেখানে সেখানে তৈরী হয়েছিল এক নতুন উৎসাহ এবং অস্পষ্ট আশা। (কেই, গুপ্ত, পৃঃ ৩৭)

বিদ্রোহের সময়টিকেও বেছে নেয়া হয়েছিল খুব ভেবেচিন্তে। গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। অন্যান্য বছরের মত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সৈন্য সমতলভূমি ছেড়ে বড় বড় পাহাড়ের কোলে ক্যাম্প খাটিয়েছে। রাজধানী কোলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে কম্যাণ্ডার ইন চীফ লোক-লস্কর নিয়ে সিমলা গেছেন পরিদর্শনে। সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাফ লাইনও ছেষট্টি মাইল দূরে। গভর্ণর জেনারেলও নিশ্চিন্ত। মার্চ মাসে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী হয়ে গেছে। বিলাতে বন্ধুকে লিখছেন, "বিপদ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে।" (মাইকেল, পৃঃ ২৭) তারপর ঘটল আবহাওয়ার বদল। যেমন গরম তেমনি বৃষ্টি। এপ্রিল থেকে জুন। ইংরেজরা এর কোনোটাতেই অভ্যস্ত নয়। ঠাণ্ডা দেশের মানুষ। মিরাটের তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট হিউ গাফের ভাষায়ঃ "আবহাওয়ার বিভীষিকা অদৃশ্য শত্রুর চেয়েও আতঙ্কজনক।" ১৮৪৮ সালে পাঞ্জাব অভিযানের পর রোদ বাঁচানোর হেলমেট আর মিলছে না —অন্যদিকে প্রচণ্ড বর্ষায় পথ-ঘাট ডুবে একাকার হয়ে গেছে। তায় তাঁবু নেই, যানবাহনের দুষ্প্রাপ্যতা। (ব্রোক, পৃঃ ১৮২; কোলিয়ার, পৃঃ ৮১) এমন অবস্থায় লড়াই করবে কি করে? আর এই রকম জঘন্য আবহাওয়ায় যা' ঘটার তাই ঘটল। কলেরা, এই কলেরায় কতজন যে মারা গেল তার ইয়ত্তা নেই। ছ' সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে মারা গেলেন উপর্যুপরি দুই কম্যাণ্ডার ইন চীফ। ২৬শে মে' অ্যানসন এবং ৫ই জুলাই বার্ণাড। এ ছাড়া অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন জেনারেল হ্যাভলক, আগ্রার চীফ কমিশনার কলভিন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ণেল ফ্রেজার। রবার্টস লিখছেন, "দিল্লী অবরোধের সময়ে যুদ্ধে যত না লোক মারা গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি মারা গেছে কলেরা, রোদ এবং পেটের অসুখে। ফলে মনোবল হাজার গুণ ভেঙে পড়েছিল।" (পৃঃ ২৫২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই নড়বড়ে। উত্তর-পশ্চিমে মিরাট থেকে দক্ষিণ পূর্বে দানাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ট্রেভেলি-য়ানের মতে কেবলমাত্র দুই রেজিমেণ্ট কমজোরি ইউরোপীয় বাহিনী ছিল। (পৃঃ ২২) গঙ্গার উভয় তীরের দুর্গগুলো ছিল প্রায় অরক্ষিত। ফতেগড় দুর্গে তো ভয় দেখানোর জন্য নকল কামান বসাতে হয়েছিল! (কোলিয়ার, পৃঃ ৯১) বিদ্রোহের সাফল্যের পক্ষে এর চেয়ে মহেন্দ্রক্ষণ আর কি হতে পারে? রমেশচন্দ্র মজুমদার মিরাটসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের কাজ-কর্মে একটি 'প্যাটার্ণ বা 'মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে সিপাহীরা

ইউরোপীয় অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করে "জেল থেকে বন্দীদের মুক্তি দিল এবং তারপর হয় দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে অথবা স্থানীয় প্রধানদের সাথে হাত মিলিয়েছে।" (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ১৩৪) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এটা একটা দেখবার বিষয় যে ১০ই মে মিরাটের বিদ্রোহীদের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল, "দিল্লী চলো", তাঁর মতে "যখনই কোনো সেনা ছাউনীতে বিদ্রোহ দেখা গেছে এই একই ঘটনা বার বার ঘটে চলেছে। এমনকি যেখানে সিপাহীরা দিল্লী যায়নি সেখানে তারা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে।" (সেন, পৃঃ XIX) নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেও সম্রাটের নামে মুদ্রা খোদিত করে-ছিলেন। বিদ্রোহ চলাকালীন বিভিন্ন বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং একের বিপদে অন্যের সাড়া দেযাও লক্ষণীয়। অবশ্য এগুলো কোনোটাই ঘটতে পারে না—যদি না আগে থেকেই পারস্পরিক আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। যেমন, জেনারেল হ্যাভলকের বিরুদ্ধে নানার বাহিনী অযোধ্যার বাহিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। (গুপ্ত, পৃঃ ১৪৯) আবার নানার অনুমতি নিয়ে ১৮৫৭র ডিসেম্বরে তাঁতীয়া টোপী রানী লক্ষ্মীবাই'য়ের সাহায্যের আবেদনে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেন। কুঁওর সিং এর সঙ্গে নানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কুঁওর সিংএর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অমর সিং'এর পরিকল্পনা ছিল কালাপির নানা রাওয়ের সাথে হাত মেলানো। বেনীমাধো (শঙ্করপুর), দেবী বখসা (গোণ্ডা), মুহম্মদ হুসেন (বিহার), মেহেদী হাসান (চান্দা), অমর সিং (জগদীশপুর), খাঁন বাহাদুর খাঁ (রোহিলাখণ্ড), বেগম হজরত মহল (অযোধ্যা), মাম্মু খাঁ (লক্ষ্ণৌ), নানাসাহেব তার ভাই বালা সাহেব এবং সেনাপতি জোযালা প্রসাদ (কানপুর)—এঁরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে বিদ্রোহ চলাকালীন একে অপরের সাহায্যে এসেছেন। এক সময়ে মধ্যভারতে (সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া) পূর্ণ দখল করা ইংরাজদের পক্ষে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ একই সঙ্গে বিদ্রোহের তিন শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁতীয়া টোপী, রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং অংশতঃ কুঁওর সিং এর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। (মজুমদার, পৃঃ ৫৭৯)

মহাবিদ্রোহ যেভাবে জলন্ত অগ্নিশিখার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সবাই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল

কোথাও একটি প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজের জন্যে। খেলোয়াড়রা রেডি, অপেক্ষা শুধু বাঁশীর জন্য। ১০ই মে' মিরাট, আম্বালা; ১৩ই মে ফিরোজপুর; ১৪ই মুজঃফরনগর; ২০শে আলীগড; ২১শে নওশেরাও হোতি মরদান (দু' একদিনের মধ্যে; ২৩শে এটোয়া, মেনপুর, ২৫শে রুরকী; ২৭শে এটা, ৩০শে হোদাল, মথুরা এবং লক্ষ্ণৌ; ৩১শে বেরিলী এবং শাহজাহানপুর, ১লা জুন মোরাদাবাদ এবং বাদাউন; ৩রা জুন আজমগড, সীতাপুর; ৪ঠা মালাও, মোহামদি, বারাণসী এবং কানপুর, ৬ই ঝাঁসী এবং এলাহাবাদ; ৭ই ফৈজাবাদ; ৯ই দারিয়াবাদ এবং ফতেপুর—তারপর ১৮ই জুন ফৈজাবাদ। এরপরের অগ্রগতি ক্রমশঃ মন্থর। একেবারে ১লা জুলাই হাতরাস এবং অন্যান্য। যাই হোক, একটা জিনিস লক্ষণীয় ১০ই মে' থেকে মাত্র আটত্রিশ দিনের ব্যবধানে যে বিদ্রোহগুলি ঘটল তার ভৌগলিক সীমানা পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর পশ্চিম জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কেবলমাত্র মিরাট আর দিল্লীর চল্লিশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানেই বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা ছিল সেখানেই "অশান্তি দেখা দিয়েছিল।" কিন্তু শুধু সিপাহারা নয় উপরোক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরাও কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর থেকে বোধ হয় অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে প্রচার ও পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরেই চলছিল।

মৌলানা আজাদ সিপাহীদের "দিল্লী চলা"র মধ্যে এক "স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া" লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে এটি কোনো আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতি নয়। (সেন, পৃঃ XIX) ইতিহাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় চিরকালেই আস্থা কম। যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততার পেছনেও কাজ করে দীর্ঘকালের শিক্ষা, প্রচার ও অভিজ্ঞতা। সিপাহীরাও এর বাহিরে ছিল না। তা' না হ'লে বিশ্বাস করতে হবে কোন এক যাদুদণ্ডে বাহাদুরশাহ বিভিন্ন স্থান থেকে সিপাহীদের দিল্লীতে আকর্ষণ করেছিলেন! আসলে দিল্লী দখল ও বাহাদুর-শাহকে সম্রাট হিশেবে মেনে নেয়ার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল—তা নিশ্চয় সিপাহী-দেরও পূর্বাহ্নে বোঝানো হয়েছিল। মিরাটে বিদ্রোহের পর তাই আমরা দেখি সিপাহীদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে দিল্লী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে। মুনশী মোহনলাল এর সাক্ষী। অবশ্য মুনশীর মতে দিল্লীর

পরিকল্পনা প্রথমে সিপাহীদের ছিল না। যদি তাই হয়—তাহলে হঠাৎ দিল্লীর বিষয়টা কিভাবে ওই রকম জরুরী সময়ে আলোচনায় এসে গেল এবং সবাই রাজীও হয়ে গেল? (মুনশীর বক্তব্য, ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ১৩২) আবার কানপুরের ২নং লাইট ক্যাভেলরীর ক্ষেত্রেও প্রথমের দিকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হওয়া এবং পথিমধ্যে কল্যানপুরে যখন নানা সাহেব রাজী হলেন নেতৃত্ব দিতে তখন তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কানপুরে ফিরে আসা—এ দু'টোই ভাবনা-চিন্তার ফলই। কোন স্বতঃস্ফূর্ততা এর পেছনে কাজ করেনি। মনে রাখা দরকার সে ক্ষেত্রেও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানাতে তারা কোনো ভুল করেনি। শুধু মিরাট, কানপুর নয়, বেরিলী নিমক, নাসেরাবাদ, গোয়ালিয়র, কোটা এবং ঝাঁন্সী থেকেও সিপাহীরা দিল্লী এসে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিল। (রবার্টস, পৃঃ ১৭৯)

মার্চ ও এপ্রিলে উত্তর ভারতের নানা স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিল। নিকৃষ্ট শ্রেণীর আটা, চিনি, ঘি বাজারে আসতে লাগল। মিরাটে গুজব রটল অস্থি চূর্ণ দিয়ে জাতিনাশের জন্য এসব জিনিষ বাজারে পাঠানো হচ্ছে। সবটাই হয়ত গুজব নয়। ঘাটতির দিনে অসাধু ব্যবসায়ীরা এসব করতেই পারে। লক্ষ্যণীয় ঘাটতির কথাটা কোনো ঐতিহাসিকই অস্বীকার করেননি। (কোলিয়ার, পৃঃ ৩২) সরকারের দায়িত্ব জনসাধারণের মনে আস্থা সৃষ্টি করার। কিন্তু জানুয়ারীতে (১৮৫৭) চর্বি মেশানো টোটা আমদানীর পর সিপাহী বা জনসাধারণের কাছে সরকারের আর কোনো মর্যাদা ছিল না। ৯ই মার্চ প্রকাশ্যে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে ৮৫ জন বিদ্রোহী সিপাহীকে জনসাধারণের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জেলখানায় তাদের অপরাধ—টোটা গ্রহণে অসম্মতি। ইতিমধ্যে শহরের দেয়ালগুলিতে পোষ্টার পড়তে শুরু করেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে। সবদিক দিয়েই পরিস্থিতিটা অগ্নিগর্ভ। জনসাধারণ উত্তেজিত আর অন্যদিকে সিপাহীরা অপমানিত। সহকর্মীদের লাঞ্ছনা তাদের ক্ষিপ্ত করেছে। ১০ই মে, রবিবার সন্ধ্যার দিকে চার্চ প্যারেডের জন্য ব্রিটিশ রাইফেল বাহিনী জমায়েত হল। এই জমায়েত হওয়াটাকে ৩নং ক্যাভেলরীর সিপাহীরা ধরে বসল (ঠিক করে হোক অথবা ভুল করে) তাদের উপর আক্রমণের আয়োজন। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিনা দ্বিধায় বন্দুক তুলে নিয়ে নিশানা করল ব্রিটিশ অফিসারদের।

ক্র্যাক্রোফট উইলসনের মতে বিদ্রোহের তারিখ ছিল রবিবার, ৩১শে মে। কিন্তু বিদ্রোহ ঘটল ১০ই মে। উইলসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১শে মে' বেঙ্গল আর্মির সর্বত্র একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘটার কথা। ১০ই মে হঠাৎ বিদ্রোহ ঘটার ফলে সর্বত্র একই তারিখ রক্ষা করা সম্ভব হল না। রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন, যাঁরা তারিখের সত্যতাটিকে স্বীকার করেন না, তাঁরাই আবার একই দিনে সর্বত্র বিদ্রোহ না ঘটার কাহিনীকে বিদ্রোহীদের অসংগঠিত থাকার উদাহরণ হিশেবে ব্যবহার করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বিদ্রোহ একই তারিখে সর্বত্র না ঘটে প্রায় দু'মাস ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছিল। তার মতে মিরাটের হঠাৎ অভ্যুত্থানের ফলে বিদ্রোহীরা যদি নির্ধারিত তারিখটি (৩১শে মে') আরো এগিয়ে আনত ("যখন তারা সর্বত্র একই সঙ্গে বিদ্রোহ করতে পারবে") তাহলে বোঝা যেত বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহীদের মধ্যে বোঝাপড়া আছে। (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ২০৮) সুরেন্দ্রনাথ সেনও একই সঙ্গে সর্বত্র বিদ্রোহ না ঘটার জন্য বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া ছিল বলে মনে করেন না। যুক্তি হিশেবে দেখিয়েছেন দিল্লী এবং মিরাটের পর পনেরোদিন সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল "a complete lull for a fortnight" (সেন, পৃঃ ৫০২)

কিন্তু মহাবিদ্রোহের ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যায় না যে "পনেরোদিন সম্পূর্ণ স্তব্ধ ছিল।" বরং বিভিন্ন স্থানে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতা ক্রমান্বয়ে ঘটতেই থাকে। ১২ই মে' পেশোয়ারের মিয়ামীর অঞ্চলে ২৫ হাজার সিপাহীর সম্ভাব্য বিদ্রোহের সংবাদ গোপন সূত্রে জানতে পেরে (১৩ই মে' বিদ্রোহ করার কথা) সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরস্ত্র করা হল। ১৩ই মে' খুব সকালে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন লাহোর থেকে ৩০ মাইল দূরের গোবিন্দগড়ের দুর্গের সিপাহীদের সম্পর্কে। ১৩ই মে' ফিরোজপুরে অস্ত্রাগারের জিম্মাদার ৪৫নং বাহিনীর সিপাহীরা ব্যর্থ বিদ্রোহ করল। ১২ই মে' দিল্লী পতনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই পেশোয়ারের ৫০০০ হাজার দেশীয় সৈন্যকে ইংরেজরা কোনো রকম সুযোগ না দিয়েই নিরস্ত্র করে ফেলল। কিন্তু সর্বত্র এ রকম আগাম বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। যেমন, ১৩ই মে ফিরোজপুরে, ১৪ই মে মুজঃফরনগরে, ২০শে মে' আলীগড়ে, ২১শে মে' নওশেরাতে আর ২৩-২৪শে মে' হোতি মরদান, এটোয়া এবং মৈনপুরে—সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ১১ই মে দিল্লী দখলের পরও সিপাহীরা

চুপ করে বসে থাকেনি। এ ছাড়া মোরাদাবাদে ১৯শে মে ২৯নং ইনফেন্টির এবং বিজনোরে অসামরিক জনসাধারণের তরফে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। (ফ্রিডম. মুভ. পৃঃ ১৩৩ এবং ১৫৯)

যেহেতু বিদ্রোহ বা বিপ্লব তারিখ অথবা ঘণ্টা বাজিয়ে হয় না—তাই এর কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আগে ঠিক করে রাখলেও সব সময়ে বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করে তৎকালীন বাস্তব অবস্থার উপর। আইজাক ডয়েসচারের মতে ১০ই অক্টোবরের (প্রাক-বিপ্লব ক্যালেণ্ডার) সেন্ট্রাল কমিটি লেনিনের নেতৃত্বে চূড়ান্ত বিপ্লবের তারিখটি নির্দিষ্ট করেছিলেন ঐ মাসের ২০ তারিখে, (স্তালিন, পৃঃ ১৭০) কিন্তু রুশ বিপ্লব ঘটল ২৫শে অক্টোবর (বা ৭ই নবেম্বর), অবশ্য "সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস (বলশেভিক)" (মস্কো, ১৯৪৫ সংস্করণ) বইতে ২০শে অক্টোবর তারিখটির কথা উল্লেখ না করলেও বলা হয়েছে যে ট্রটস্কি দম্ভের সঙ্গে "তারিখ জানিয়ে দেন শত্রুদের—যে তারিখে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো স্থির হয়েছিল" ফলে তারিখ বদলাতে হল। পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি ঠিক করলেন তারিখটি বদলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঘটাতে।" (পৃঃ ২০৭) আসলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সাথে সংহতি রেখেই বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের কর্মসূচী ঠিক করতে হয়। সেখানে কোনো একটি তারিখ পবিত্র বলে গণ্য হতে পারে না। একমাত্র সন্ত্রাসবাদীরাই তারিখকে অপরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে সমগ্র কখনও বিরাট বিষয় হয় না। যেহেতু মহাবিদ্রোহ কোনোভাবেই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার প্রতীক ছিল না তাই তার লক্ষ্য এবং কর্মক্ষেত্র দু'টোই ছিল বিশাল। আর বিশাল বলেই বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান একই সংগে এক নির্দিষ্ট তারিখে সর্বত্র নাও ঘটতে পারে। আর ঘটেনি বলেই কি এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে মহাবিদ্রোহের পেছনে কোনো সংগঠিত শক্তি কাজ করেনি? ১৭৮৯ সালে ১৪ই জুলাই বাস্তিলের পতনের পর পারী পথ দেখালো। ফ্রান্সের বাকী অংশ তাকে অনুসরণ করল। এই অভ্যুত্থান চলেছিল সারা আগষ্ট মাস ধরে। ১৮৪৮ সালের ইতালীর মুক্তি সংগ্রামেও লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থান। জানুয়ারীতে সিসিলি, দু'মাস পরে সার্ডিনিয়ায় তারও পরে ফ্লোরেন্সে।

অবশ্য মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে একটি তারিখে একসংগে সর্বত্র অভ্যুত্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিনা সন্দেহ। যদি ৩১শে মে তারিখটিকে সাধারণ

ভাবে নির্দিষ্ট বলাও যায় তবুও সেটিকে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী বদল করার ক্ষমতা নিশ্চয় সুবাদার মেজর পর্যায়ের সিপাহীদের হাতে ছিল। তাই দেখা যায় পেশোয়াবে গোপন চিঠি মারফত ৫১নং দেশীয় বাহিনীর সুবাদার মেজর ৬৪নং-কে জানাচ্ছেন যে '২২শে মে' বিদ্রোহের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে। "যে ভাবে পাব তোমরা ২১শে পেশোয়ার চলে এস।" (রবার্টস, পৃঃ ১১১)

যাইহোক বিদ্রোহ নির্দিষ্ট তারিখে বা একই সময়ে সর্বত্র না হলেও বোঝায় না যে তাব পেছনে কোনো সুসংগঠিত পূর্ব-পরিকল্পনা কাজ করে নি। বিদ্রোহ অসফল হলে বড জোব বলা যায় সে পবিকল্পনা ছিল ত্রুটীপূর্ণ তার বেশি কিছু নয়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঘটার ফলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। ফলে আশংকা করা হয় ইংরাজরা যদি পরাজিত হত তাহলে প্রতিটি নেতা স্বস্ব প্রদেশে প্রধান হয়ে উঠতেন। কিন্তু মনে হয় এরকম একটা সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্রাট সচেতন ছিলেন। তাই অন্যদের আনুগত্য স্বীকারের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি তার নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা জাহির করেছিলেন। এক পত্র মারফত বিদ্রোহীরা রাজন্যবর্গকে জানিয়েছিলেনঃ—"ঈশ্বরেব কৃপায় একশো বছর পরে হিন্দুস্তানে আবাব সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে এসেছে। সে কারণে আপনাদেব কর্তব্য আপনাদেব অধীন বিভিন্ন অঞ্চল সতর্কতার সংগে শাসন করা—প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সম্রাটেব কাছে হাজির হওয়া এবং তাঁকে নজরানা দেওয়া। আর সেই সাথে সেনা এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা—যতদিন না রাজকীয় বাহিনী ইংরাজদের পরাস্ত করছে ও তাদের গড থেকে বিতাডিত করছে।" সম্রাটের এই পত্র প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, টঙ্ক এবং জয়পুরের নৃপতিরা। পত্রগুলি পাঠানো হয়েছিল রাজকীয় পত্রবাহক বা সৈনিকদের মারফত। (মাইকেল, পৃঃ ২১৩) সম্রাটের এই নির্দেশনামা প্রেরণ থেকে বোঝা যায় বিদ্রোহের পেছনে শুধু একটা পরিকল্পনা ছিল তাই নয়—তার উদ্দেশ্যটিও ছিল সুস্পষ্ট। সম্রাটের পরামর্শ সভা বেশ সুসংগঠিত ভাবেই সম্রাটকে পরিচালনা করছিলেন।

সমস্ত বিদ্রোহটিকে একটি নাটকের মত সাজিয়ে নিলে, প্রথম দৃশ্যে দেখা যাবে, রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক ষড়যন্ত্র—যার সঙ্গে জড়িত রাজা-রাজড়া থেকে সামান্য

সন্ন্যাসী-ফকীব। দ্বিতীয় দৃশ্যে মিবাট এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ ও সিপাহী-দেব একযোগে দিল্লী আগমন এবং সম্রাটেব প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। আব সর্বশেষ দৃশ্যে সম্রাটেব তবফে বিদ্রোহীদেব কাছে ঘোষণা যে তিনিই হিন্দুস্তানেব একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাব অধিকাবী। অবশ্য এই সঙ্গে এটাও মনে বাখা দবকাব যে "কোর্ট" প্রতিষ্ঠিত হওযাব ফলে সম্রাট কেবল এক নিযমতান্ত্রিক বাজায পবিণত হযেছেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন সিপাহীবা যদি পূর্বাহ্নে সুসংহত একটি ষডযন্ত্রেব সাথে জডিত থাকত তাহলে দেখা যেত সর্বত্র সিপাহীবা বিদ্রোহেব ধ্বজা তুলে ধবেছে এবং এদেব মধ্যে কেউ ইংবাজদেব সাহায্যেব জন্য এগিযে আসত না। এব উত্তবে সুবেন্দ্রনাথ সেনেব অন্য প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত কবা যেতে পাবে। "একথা আমবা যেন ভুলে না যাই যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবে কেবল এক দৃঢ সংকল্পবদ্ধ সংখ্যালঘু অংশই সক্রিয় ভূমিকা নয। অধিকাংশই থাকে নিষ্ক্রিয এবং একটি স্বার্থপব অংশ প্রকাশ্যে শাসক গোষ্ঠীব সাথে যোগ দেয। কোথাও কোনো বিদ্রোহ সার্বিক সমর্থন লাভ কবে না। আমেবিকা স্বাধীনতা অর্জন কবলে একদল বাজভক্ত ক্যানাডায় যাওযা পছন্দ কবেছিল। বিপ্লবী ফ্রান্সেও বাজভক্তেব অভাব ছিল না।" সুতবাং সিপাহীদেব মধ্যেও দোদুল্যমানতা ও বাজভক্তেব যদি অভাব না ঘটে থাকে তাতে বিস্মিত হওয়াব কিছুই নেই। তবে সৌভাগ্য-বশতঃ এদেব সংখ্যা যে ক্রমশঃই কমে আসছিল তাব প্রমাণ বিদ্রোহ চলাকালীন ইংবেজদেব তবফে সাধাবণ একটা শ্লোগানই হযে বিদ্রোহ চলাকালীন সিপাহীকে বিশ্বাস না কবা। "কোনো দেশীয সৈন্যেব উপব বিশ্বাস বাখা এখন প্রশ্নেব বাহিবে।" (জেনাবেল হুইলাবেব চিঠি—স্যাব হেনবী লবেন্সকে। কোলিযাব, পৃঃ ১১৬)

কেবলমাত্র টোটা এত বড এক বিদ্রোহেব কাবণ, একথা ডিসরেলী বিশ্বাস কবতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সঙ্গতভাবেই ইংলণ্ডেব পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "সৈন্যদেব আচবণ কি একটা আকস্মিক আবেগেব ফল নাকি তা' একটা সংগঠিত চক্রান্তেব পবিনতি?" (মার্কস, পৃঃ ৫১) এব কাবণ যে টোটাব অজুহাত দেখিয়ে সিপাহীবা বিদ্রোহ শুরু করেছিল প্রয়োজনে সেই টোটাই তাবা ইংবেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দ্বিধা কবেনি। এ কারণে

বাহাদুর শাহের বিচারের সময়ে সরকারী পক্ষের উকীল সিপাহীদের মতলবকে পুরোপুরি রাজনৈতিক বলে অভিহিত করে ছিলেন। (সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪৩) লর্ড রবার্টস লিখছেন, "যখন সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আবহাওয়া তৈরী করা হচ্ছে এবং সক্রিয় তৎপরতা চলেছে তখন এটা আশা করাই যায় না যে দেশীয় বাহিনী সেই আন্দোলন থেকে প্রভাবিত হবে না, বিশেষ করে যে আন্দোলন তাদের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই শক্তিশালী হতে পারে না। এ ছাড়া তারা নিজেরাও বিগত তিরিশ অথবা চল্লিশ বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিস্পৃহ দর্শক ছিল না।" পৃঃ ৪২৯) মার্কসের মতে ভারতীয় জনগণকে অধীন করার জন্য ইংরেজরা সৃষ্টি করেছিল দেশীয় সৈন্যবাহিনী। কিন্তু দেশীয় বাহিনী গড়ে বৃটিশরা ভাবতে "সেই সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের জন্য এই সবপ্রথম একটা সাধারণ প্রতিরোধ কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে।" এ কারণে মার্কসের সিদ্ধান্ত বিদ্রোহ শুরু হয়েছে সুবিধাভোগী সিপাহীদের তরফে —বুভুক্ষা পীড়িত লুণ্ঠিত রায়তদের থেকে নয়। তার অর্থ এই নয় যে জনগণের কোনো ভূমিকা ছিল না—যা' ভিনসেণ্ট স্মিথ, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা অতি যত্নের সঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে মহাবিদ্রোহ কেবল সিপাহীদের—আর তা' ছিল নিতান্ত সামরিক চরিত্রের (রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন "সিপয় মিউটিনি" গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯১ ; স্মিথ, "military revolt" পৃঃ ৬৬৩ , অকসফোর্ড, ১৯৬১) মার্কস কিন্তু মহাবিদ্রোহের তিন মাসের মধ্যে (১৮৫৭, ১৪ই আগষ্ট) "ভারত প্রশ্ন" শিরোনামায় সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে সিপাহীরা হাতিয়ারের বেশি কিছু নয়। অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ভারতীয় জনগণ, অসহনীয় ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে নামে। ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহরূপে দেখাতে চায়, তার সঙ্গে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা' লুকোতে চায় তারা! মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকেই আন্দোলনটিকে দেখান একটা জাতীয় বিদ্রোহ হিশেবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীর জনগণের বিপ্লবরূপে। (মার্কস, পৃঃ ১০) রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ সত্ত্বেও বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহ বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। সেনের মতে বাংলা ছিল "নিরুপদ্রব প্রদেশ" এবং মজুমদারের মতে চট্টগ্রাম (১৮ই নভেম্বর, ১৮৫৭, ৩৪নং ইনফেন্ট্রি) ও ঢাকা (২২শে নভেম্বর, ১৮৫৭)

ছাড়া বাংলা দেশে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে এবং পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ আরো অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালীরা সদ্য ইংরাজী শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা তখন কোম্পানীর অধীনে নতুন নতুন চাকুরী লাভের স্বপ্ন দেখছিল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় "বীরত্বের চেয়ে বিবেচনাকে বেশি ঠাই দিয়েছিল।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার প্রার্থনা সভায় ব্রিটিশদের প্রশংসা করে বলেন, "তারা (ব্রিটিশরা) শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দিয়ে জয় করতে চায়। সে তুলনায় আমাদেয় মনোভাব কত জঘন্য।" ("একমেবা দ্বিতীয়ম্" কলকাতা, এপ্রিল, ১৮৬০) কিন্তু তবু বাংলা দেশ ইংরেজদের কাছে একেবারে বিপদমুক্ত এলাকা ছিল না। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ বলেছেন, এটা বলা ভুল হবে যে "বাঙ্গালীরা আমাদের প্রতি অনুরক্ত"। সি. ঈ. বাকল্যাণ্ড তার "বেঙ্গল আনডার দি লেফটেন্যাণ্ট-গভর্ণরস্" (১ম খণ্ড) বইতে মন্তব্য করেছেন যে বাঙ্গলা দেশে এমন একটি জেলা সে সময়ে ছিল না যেখানে প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে বিপদের ঝুঁকি অথবা ভয়ের আশঙ্কা করেনি। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭, মুর্শিদাবাদে সিপাহীদের যে বিদ্রোহ ঘটেছিল ঐতিহাসিক কেই-র ধারনা, তা' যদি মুর্শিদাবাদের নবাব মনসুর আলী খাঁর সাহায্য পেত তা'হলে প্রচণ্ডভাবে বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সাধারণ বাঙ্গালীরা ইংরাজ-প্রেমী ছিল। সাংবাদিক রাসেল ১৮৫৭ সালে বর্দ্ধমান ভ্রমণে এসে সাধারণ মানুষের শাদা চামড়ার প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণার দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর ভাষায়ঃ ওঃ! ওই চাউনী! "Oh that language of the eye!"

কথায় আছে সাফল্যের একটি কারণ সেটি হচ্ছে সাফল্য। কিন্তু অসাফল্যের পেছনে কাজ করে বহু। তেমনি অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলে ঐতিহাসিকরা খুঁজে এবং খুঁড়ে বার করেন বহুবিধ সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য কারণ। ইতিহাসকে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। অপরাধ মূলক বিবেক তাকে পীড়া দেয়। সে মনে করে অসাফল্যের ফলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নৈতিক অধিকার নেই। ফলে চলে একতরফা সওয়াল আর বিচারকের এক পেশে স্বার্থসংশ্লিষ্ট রায়। অথচ একবারও কি বিস্ময় সৃষ্টি করে না কেন এমন সম্ভাবনাময় অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল? যা স্মিথকে স্বীকার করতে

হয়েছে যে মহাবিদ্রোহে সাফল্যের পাল্লাটা বিদ্রোহীদের দিকেই বেশি ঝুঁকে ছিল। (পৃঃ ৬৭১) একথা ঠিক যে রাজন্যবর্গ, তালুকদার প্রমুখ সামন্তশ্রেণী শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়িয়ে ছিল গভর্নর জেনারেল ক্যানিং এর মার্জনার আশ্বাস পেয়ে। এও ঠিক যে ইংরেজরা স্বদেশ থেকে অতিরিক্ত অর্থ, উন্নত ধরণের অস্ত্র এবং সুশিক্ষিত হাইল্যাণ্ডার সেনা আমদানী করেছিল; চীনগামী ইংরেজ সৈন্য কলকাতায় নেমেছিল; ছিল বিদ্রোহীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার অভাবে সর্বভারতীয় ঐক্যের দুর্বলতা। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ফিল্ড মার্শাল হিশেবে যাঁর প্রমোশন হয়েছিল সেই রণনীতিজ্ঞ প্রত্যক্ষদর্শী লর্ড রবার্টসের মতামতটিকে বোধ হয় একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। তাঁর মতে দিল্লী বিজয়ে শিখ, গুর্খারা আর লক্ষ্ণৌ বিজয়ে হিন্দুস্তানীরা যদি সাহায্য না করত তাহলে ওই দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্থান—যা যুদ্ধের মোড ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা দখল করা সম্ভব হোত না। (রবার্টস, ভূমিকা, পৃঃ VIII) এই প্রসঙ্গে কর্ণেল ম্যালেসন ইংরেজদের বিজয় সম্পর্কে লর্ড বেকনসফিল্ডের যে উক্তির উদ্ধৃতি সোৎসাহে দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। "এর চেয়ে সত্য বোধহয় আর কিছু নেই যখন লর্ড বেকনসফিল্ড লেখেন যে সব কিছুই নিভর করে "জাত" এর উপর" (ম্যালেসন, ৪র্থখণ্ড, ভূমিকা, XII) মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে যে 'সব কিছুই নির্ভর করেনি "জাত" এর উপর" তার প্রমাণ লর্ড রবার্টসের উপরোক্ত অভিমত। এমনকি তাঁর মতে স্যার জন লরেন্সের (পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার) চেষ্টা সত্ত্বেও কলকাতার উত্তরে সমস্ত দেশটাই কিছুকালের জন্য হাতছাড়া হয়ে যেত যদি না পাঞ্জাব এবং দেরাজাত (সিন্ধুর অপর পারের অঞ্চল) আমাদের প্রতি অনুগত থাকতো।" (রবার্টস, পৃঃ VIII-IX)

অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু মহাবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ছিল না—ছিল প্রতিপক্ষ ইংরেজ জেনারেলদের মধ্যেও এবং তা খুবই তীব্র ও তিক্ত। যার উৎস ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষা। অপ্রত্যাশিত বিদ্রোহের সামনে পড়ে জরুরী অবস্থায় কর্মদক্ষতার অগ্রাধিকারের বেনামীতে বহু জুনিয়ারকে সিনিয়ারের পদ দেয়া হল। অযোধ্যার চীফ কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স গভর্নর জেনারেলকে প্রস্তাব দিলেন যদি বিদ্রোহে তাঁর কোনো অঘটন ঘটে তাহলে যেন জুনিয়ার মেজর ব্যাঙ্কসকে সে পদে বসানো হয়। তাঁর সুপারিশ "সিনিয়রিটি বজায় রাখার এ সময় নয়।" (সেন, পৃঃ ১৯০) কানপুরে ব্রিগেডিয়ার

পলসনবি'র আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর জুনিয়ার জেমস জর্জ নীল ৩৭নং নেটিভ ইনফেন্ট্রিকে নিরস্ত্র করলেন। এই অদূরদর্শী আচরণের ফলে যেখানে বিদ্রোহ হওয়ার কথা ছিল না সেই ৩৭নং বিদ্রোহের রাস্তা ধরল। (সেন, পৃঃ ১৫৩) এদিকে কর্ণেল নীলের সাথে জেনারেল হ্যাভলকের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। কোলিয়ারের ভাষায় হ্যাভলকের" "অগ্রগণ্য শত্রু" "লক্ষ্ণৌ অভিযান সম্পর্কে নীল যখন তাঁব পদ মর্যাদা ভুলে উর্দ্ধতন অফিসার হ্যাভলককে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উপদেশ দিতে গেলেন তখন ক্রুদ্ধ জেনারেল তাঁকে জানালেন কেবলমাত্র জনস্বার্থে (public interest) তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিচ্ছেন না। (গুপ্ত, পৃঃ ১৫১) মেজর জেনারেল আউটরাম বয়স ও অভিজ্ঞতায় ছোট হওয়া সত্ত্বেও কানপুর অভিযানে তাঁকেই জেনারেল হ্যাভলকের উপর-ওয়ালা বানানো হয়েছিল। ঈর্ষা এবং মনান্তর এড়ানোর জন্য আউটরাম স্বেচ্ছায় তাঁকে চীফ কম্যাণ্ডারের সম্মান দেন, এক ঘোষণায় জানানো হয়ঃ "মেজর জেনারেল লক্ষ্ণৌ অভিযানে বাহিনীব সঙ্গে যাবেন অসামরিক মর্যাদায় অর্থাৎ অযোধ্যার চীফ কমিশনাব হিশেবে এবং জেনাবেল হ্যাভলককে যুদ্ধে সাহায্য করবেন এক স্বেচ্ছাসেবক রূপে। লক্ষ্ণৌ দখলেব পব মেজর জেনারেল আবার বাহিনীর নেতৃত্ব নেবেন।" (ব্রোক, পৃঃ ২০৪) অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে গেলে যে এ ধরনের অনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে হয় তা' সহজেই অনুমেয়। সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখছেন বিয়াল্লিশ বছর সামরিক বিভাগে কাজ করেও হ্যাভলকের প্রমোসান খুব দেরীতে হচ্ছিল। এর কারণ আর যাই হোক কর্মদক্ষতার অভাব নয়। কম্যাণ্ডার ইন চীফ অ্যানসনেব মৃত্যুর পর যখন সাময়িক ভাবে ওই পদে মাদ্রাজ আর্মিব লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল স্যার প্যাট্রিক গ্রাণ্টকে নির্বাচিত করা হল তখন কানপুরের স্যার হিউ হুইলারের মনে হল বাহান্ন বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে সেবা করে তিনি শেষ পর্যন্ত কি পুরস্কার পেলেন? "...to be thus snperseded" মর্মাহত হুইলার চিঠিতে আক্ষেপ করলেন। "I write with a crushed spirit for I had no right to expect this treatment"। (কোলিয়ার, পৃঃ ১১৬-১১৭) ফতেগড় দখলের পর ইংরেজ সৈন্যকে মূল্যবান এক মাস সময় সেখানে বৃথা অতিবাহিত করতে হল কেন না গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং ও কম্যাণ্ডার ইন চীফের মধ্যে গুরুতর মত পার্থক্য দেখা দিল রোহিলাখণ্ড এবং লখনউয়ের মধ্যে কোনটি আগে আক্রমণ করার বিষয় নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ক্যানিংয়ের

আদেশ মত লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফতেগড়ে ইংরেজ শিবিরে অকারণ এই দেরীর জন্য দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। (রবার্টস, পৃঃ ৩৮৭-৮৮) ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর উত্তর প্রাচীর ইংরাজরা আক্রমণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের জয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ১৩ই সেপ্টেম্বর মাঝরাত্রি পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিল গুরুতর মতভেদ। এমন কি জেনারেল নিকলসন ঠিক করেছিলেন ১৩ই তারিখে যদি সর্বাধিনায়ক আর্কভেল উইলসন পরের দিন আক্রমণের হুকুম দিতে গররাজী হন তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক সরিয়ে দিয়ে ওই আসনে ৫২নং লাইট ইনফেন্ট্রির কর্ণেল জর্জ ক্যাম্পবেলকে বসানো হবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা তিনি সাব-অলটার্ণ রবার্টসকে গোপনে জানিয়েছিলেন। (রবার্টস, পৃঃ ২১৫)

মহাবিদ্রোহে ইংরাজদের সাফল্যের পেছনে ভিনসেণ্ট স্মিথ সেই ১৯১৯ সালে অসামান্য সাহস এবং নৈতিকতার বহিঃ প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন, যা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জিত হয়ে অটুট আছে। পার্শিভ্যাল স্পীয়ার যিনি ১৯৫৮ সালে এই অংশকে পুর্ণলিখন ("Rewritten") করেছেন তিনি স্মিথের অন্যান্য বক্তব্যকে খারিজ করলেও উপরোক্ত মন্তব্যের উপর কোন হস্তক্ষেপ করেননি। (অকসফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১ সংস্করণ, পৃঃ ৬৭১) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহের সাথে সাথে ইংরেজ জেনারেলদের মধ্যে অদ্ভুত ভয় আর আতঙ্ক চেপে বসেছিল। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। শত্রুভাবাপন্ন বিরাট দেশে কয়েক হাজার ইংরাজ সৈন্য সম্বল করে যুদ্ধে নামা দিশেহারাজনক অবস্থা ছাড়া আর কি হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শী লর্ড রবার্টস লিখছেন :—'এটা লক্ষ্যণীয় বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথে বাংলা দেশের সামরিক বিভাগে প্রতিটি মিলিটারি অফিসার সে তিনি যে কম্যাণ্ডেই বা উচ্চপদে আসীন থাকুন প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একেবারে ঘটনাস্থল থেকে গায়েব হয়ে গেছলেন এবং তাদের সম্পর্কে সরকারী ভাবে আর কোনো খোঁজও পাওয়া যায়নি। অযোগ্যতার জন্য দু'জন জেনারেলকে তাঁদের ডিভিসনের কম্যাণ্ড থেকে বরখাস্ত করা হল। সাতজন ব্রিগেডিয়ারকে দেখা গেল না প্রয়োজনের সময়ে উঠে দাঁড়াতে। অপদার্থতার জন্য চারজন কম্যাণ্ডিং অফিসারকে অন্য কম্যাণ্ডে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। (রবার্টস, পৃঃ ৪৩৭) আর সাধারণ সিভিলিয়ানদের আতঙ্ক-জ্বর দেখে স্পীয়ারও হতবাক

হয়ে গেছেন। মহাবিদ্রোহ থেকে বেশ কয়েক শো' মাইল নিরাপদ দূরত্বে কলকাতায় বাস করে যে ভাবে তাঁরা দরজা বন্ধ করে বাড়ীর মধ্যে আত্মগোপন করে ক'দিন বসে থাকলেন—তা' একটা জাতির পক্ষে খুব একটা সম্মানের বস্তু নাও হতে পারে! (ব্রোক, পৃঃ ১.২-১৩৩, স্পীয়ার, পৃঃ ১৪২) বিদ্রোহ থেকে আরেক নিরাপদ জায়গা সিমলার ইংরাজ পুরুষেরা যা করলেন তা' তাঁদের স্ত্রীদেরও মর্মাহত করেছিল। তাঁরা এক ব্যাটেলিয়ান গুর্খা বাহিনীর বিদ্রোহের কেবল গুজব শুনেই শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে রেখে এক নিরাপদ খাদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

নৈতিকতা প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বললেই চলবে যে মহাবিদ্রোহের পর ইংরাজ সৈন্যদের অন্যায় অত্যাচারকে ইংরাজ ঐতিহাসিকরা সমর্থনের জন্য বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছেন। (স্পীয়ার, পৃঃ ১৪২) দিল্লীর কমিশনার অফিসের নায়েব মহাফেজ পণ্ডিত কেদারনাথ সরকারের কাছে অভিযোগ করছেন (৫ই অক্টোবর, ১৮৫৭) যে মহাবিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহীরা টাকা দাবী করেছে কিন্তু তিনি দেন নি। আর দিল্লী পুনর্দখলের পর ইংরাজ সৈন্যরা তাঁর পঞ্চাশ থেকে সত্তর হাজার টাকার মত সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে গেছে। (সেন, পৃঃ ১১৭, ফুট নোট) এতো গেল যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা—আর যুদ্ধের সময়ে তাদের শৃঙ্খলা বোধ? দিল্লীতে ইংরাজ সৈন্যকে বিপথগামী করার জন্য প্রধান সড়কগুলোয় বিদ্রোহীরা বোতল ভর্তি মদের বাক্স সাজিয়ে রেখে গেছে। যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ভুলে গিয়ে উপর ওয়ালার আদেশ অমান্য করে সেই মদ খাওয়ার জন্য ইংরাজ সৈন্যদের এক লজ্জাজনক হুড়োহুড়ি। লেফটেন্যান্ট হডসন সে দৃশ্য দেখে হতাশ ভাবে মন্তব্য করছেন, "জীবনে এই প্রথম দেখছি ইংরাজ সৈন্যরা অফিসারদের কোনো আদেশ মানছে না।" (কোলিয়ার, পৃঃ ২৬৩) অবশ্য হডসনের এ ধরণের উক্তি প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন। কারণ যেখানে জেনারেলরা নিজেরাই লুঠের ভাগীদার (যেমন, দিল্লী, ঝাঁসী প্রভৃতি) সেখানে সৈন্যরা কোন আদর্শ নেবে? দিল্লী দখলের পর আদেশ জারী হল স্ত্রী আর শিশুদের অত্যাচার থেকে রেহাই দেয়ার। মার্টিন লিখছেন, (দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ৩য় খণ্ড) সে আদেশ কোনো সৈন্য শুনলো না। শুনবে কি করে—যখন শিক্ষিত ইংরাজও "বোম্বে টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় প্রশ্ন তোলে স্ত্রী আর শিশুদের কেন রেহাই দেয়া হবে? (ক্রিডম, মুভ, পৃঃ ১৯৯) নৃশংস অত্যাচারকে কোনো

ভাবেই সমর্থন না করতে পারে অবশেষে কিছুটা লঘু করার চেষ্টায় ইংরাজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন এ দোষগুলি উভয় পক্ষেরই ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই দৃষ্টি থেকে দেখেছেন। (স্পীয়ার, পৃঃ ১৪২ এবং ফ্রিডম্, মুভ, পৃঃ ১৯৫) যদি এই অভিযোগগুলি ভারতীয়দের সম্পর্কে সত্য বলেও ধরে নেয়া যায় তর্কের খাতিরে তাহলেও মনে রাখা দবকার একদল সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্য লডাই কবছিল আর আরেক দল অপরের দেশকে গ্রাস করার জন্য লডাই করছিল। সে ক্ষেত্রে কোনটা অত্যাচার আর কোনটা আত্মরক্ষা তা সহজেই বিচার্য।

মহাবিদ্রোহে যোগদানকাবী স্বাধীনতাকামী সিপাহী ও জনসাধারণ কেবল মাত্র ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন কতখানি উৎসাহী হয়েছিল (আজমগডের বিদ্রোহীরা ডাক দিয়ে ছিল আর্থিক সম্পদ লুণ্ঠনকারী বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর ভাবতীয়দেব। বেরিলীর ইংবাজ সামরিক দপ্তরের কেরানী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন কিভাবে হাজারে হাজারে লোক কেবল চাকুবীব লোভে বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দিচ্ছিল। সেন, পৃঃ ৩৬ এবং ৪০৯) এ ব্যাপারে সংশয়েব অবকাশ থাকলেও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে ইংবেজবা সমগ্র লডাইটাকে ধর্মযুদ্ধেব আকাবে দেখেছিল। কাবণ সাধাবণ ইংরাজ সৈন্যকে যতটা খৃষ্টধর্মেব নামে উত্তেজিত করা যাবে ততটা নিশ্চয় সম্ভাব্য অথচ অনিশ্চিত লুঠের প্রলোভন দেখিয়ে নয়। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল হ্যাভলক এই লডাইকে নিয়েছিলেন ধর্মের জেহাদ হিশেবে, তাঁর জীবনের শেষ লডাই সম্পর্কে রেভারেণ্ড ব্রোক লিখছেন, "এই ভাবে ধর্মীয় মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁব শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।" (পৃঃ ১৪৭) পেশোয়ারের কমিশনার কর্ণেল হাবার্ট এডোয়ার্ডস যুদ্ধ জয়ের পরই প্রস্তাব রেখেছিলেন সমস্ত ভারতীয়দের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার। কর্ণেল হোয়েলার, মেজর ম্যাকেনজী, লেফটেন্যাণ্ট-গভর্নর জন র‍্যাসেল কলভিনেরমত বহু সামরিক অফিসার সৈন্যদের খৃষ্টধর্মে উদ্বুদ্ধ করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। (সেন, পৃঃ ১১ এবং ৪১৭, সিপয় মিউটিনি, পৃঃ ৪৩৮) শান্তি ও অহিংসার প্রতীক পবিত্র বাইবেলের বীভৎস অসম্মান দেখা যায় যখন কোলিয়ার লিখছেন লখনউর লড়াইতে জেমস 'কোয়েকার' ওয়ালেস বাইবেলের ১১৬ নং স্তোত্র উচ্চারণ করতে করতে একাই কুড়িজনকে হত্যা করলেন! (কোলিয়ার, পৃঃ ৩২২) রানী লক্ষ্মীবাঈ হয়ত ঝাঁসীর অধীনতার চেয়ে আত্ম-বিসর্জনকেই

শ্রেয়ঃ বলে মনে করে থাকবেন, হয়ত ফৈজাবাদের মৌলভীর বিদ্রোহকে কর্ণেল মালেসনের দেশপ্রেম বলে মনে হয়ে থাকবে কিন্তু দিল্লীর যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত মৃত্যুপথ যাত্রী ইংরাজ ক্যাপটেনের কাছে মনে হবে রানী (ভিক্টোরিয়া) ও দেশের চেয়েও বড় ঈশ্বর "most to Thee, My life to give..." (ঐ, পৃঃ ২৫৪) অন্ধ ধর্মান্ধতার দ্বারা পরিচালিত না হলে ইংরেজদের পক্ষে মহাবিদ্রোহে এত অত্যাচার করা সম্ভব হোত না। অবশ্য উনিশ শতকের মাঝ বরাবর পর্যন্ত পৃথিবীতে যেখানে যত অত্যাচার ঘটেছে, ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই নিয়েছে। বলকান অঞ্চলে গ্রীকরা শুধু তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেনি-একে অপরের বিরুদ্ধে ধর্মকে লোপ করার অভিযোগ এনে মুস্লিম-খৃষ্টানে হত্যার রক্তলীলা বহিয়ে দিয়েছে। ভারতে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী প্রচারে থমসন, ডাফ, মার্শমান, হেনরী মার্টিন প্রমুখ ইভানজেলিক্যাল পাদ্রীরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহ চলাকালীন রেভারেণ্ড ব্রোক (১৮৫৮) জেনারেল হ্যাভলকের জীবনী লিখতে গিয়ে ইংরাজ সৈন্যকে যেমন "ধর্মভীরু" ও "ভগবান যীশুখৃষ্টের এক নিষ্ঠ সেবক" বলে প্রশংসা করেছেন তেমনি আশা করেছেন এ বিদ্রোহের অবসান ঘটবে ভারতের জঘন্য পৌত্তলিকতার মুক্তি ঘটিয়ে "...India might be freed from abominable idolatries." (ব্রোক, পৃঃ ১-৭)

যুদ্ধের অবস্থা প্রথমের দিকে খুবই অনিশ্চিত ছিল। শিখ, গুর্খা প্রমুখ অনেক রেজিমেণ্ট যুদ্ধের গাত প্রকৃতির দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তারা বসেছিল "বেড়ার উপরে"। হাওয়া যেদিকে ঘুরবে সেদিকেই তারা ঝাঁপ দেবে। সমগ্র যুদ্ধের প্রাণভোমরাটি লুকিয়েছিল দিল্লী পুনর্দখলের সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে। ইংরাজরা জানত যত দ্রুত দিল্লী তারা পুনর্দখল করতে করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি আবার গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের কব্জা শক্ত করতে পারবে। কারণ কথাতেই আছে, "যে গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে রাখে—সেই রাখে ভারতকে।" ২৭শে মে, ১৮৫৭, স্যার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে জানাচ্ছেন যে দিল্লী যদি কয়েক দিনের মধ্যে, খুব বেশি হলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুনর্দখল না করা যায় তবে ইংরাজদের মর্যাদা সম্পর্কে এদেশের লোকের মনোবল ভেঙে যাবে। সাংঘাতিক বিপদ ঘটাবে এবং "আমরা বন্ধুহীন হয়ে পড়ব।" পাতিয়ালার

মহারাজাও আতঙ্কিত হয়ে দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেছিলেন। আম্বালার কমিশনারকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "বার্ণস সাহেব, আপনার সরকার কি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারবে?" (কোলিয়ার, পৃঃ ১৯৬) বিদ্রোহের মাত্র সাত সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে দু'জন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সহ পাঁচজন সিনিয়ার সামরিক অফিসার মারা গেলেন। সর্বত্রই তখন ইংরাজদের কী হয় দুশ্চিন্তা! রবার্টস লিখছেন, "এখনই অনেক লোকের কথা ও স্বর পালটাতে শুরু করেছে।" ওদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে হেনরী লরেন্স ইংরাজদের উদ্দীপ্ত করছেন, "একবার দিল্লী পুনর্দখল করতে পারলে, খেলাটা আমাদের অনুকূলে চলে আসবে।" অথচ প্রতিপক্ষের চেয়ে বহুগুণ সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ভ্রান্ত আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণের ফলে টিলার উপর থেকে মাত্র কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্যকে উৎখাত করতে পারল না। সবাই স্বীকার করেন পাঞ্জাব থেকে ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের সাহায্যে পাঠানো সৈন্য, কামান ও রসদ না এলে যুদ্ধে পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। অথচ ২৬শে আগষ্ট রসদ গাড়ীগুলোর উপর একবার মাত্র ব্যর্থ হামলা করে সিপাহীরা চুপ করে বসে গেল। সামরিক বিদ্যায় অভিজ্ঞ একজনও সিপাহী তাঁর যুদ্ধ কৌশল দেখাতে পারলেন না। কেন পারলেন না—তার ব্যাখ্যা লরেন্স পাননি। "নিতান্ত কতগুলো দৈব ঘটনার ফলে আমরা চরম শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি।" (ফ্রিডম, মুভ, পৃঃ ২৩৯) এর কারণ হিশেবে কার্ল মার্কস সঠিক ভাবেই বলেছেন, বিদ্রোহীরা তাদের মধ্যে থেকে এমন একটা যোগ্য লোক আবিষ্কার করতে পারেনি যাকে সুপ্রীম কম্যাণ্ড দেয়া যেতে পারত। "এ হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি"র লেখক ফরেষ্টের মুখেও মার্কসের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনি। সাহসের অভাব ছিল না সিপাহীদের অভাব শুধু ছিল নেতৃত্বের। ৮ই জুন বদল-কি সরাইয়ের লড়াইতে জিতে ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টিলা দখল করে দিল্লী পুনর্জয় সুনিশ্চিত করল। অথচ বিগত ছাব্বিশ দিন (১২ই মে—৮ই জুন) ধরে ইংরাজরা যখন শক্তি সংহত করছিল তখন বখত খাঁ একটু উদ্যম নিলেই তাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের সর্বাধিনায়ক বখত খাঁর সে দূরদর্শীতা বা ব্যক্তিত্ব ছিল না। মনে রাখা দরকার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর সুবাদারের বেশি ছিল না।